জন্ম — ১৩০৬ মৃত্যু — ১৩৩৫



শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার

প্রতিষ্ঠাতা

“দেব-সাহিত্য-কুটীর”

গিয়েও তুমি যাওনি চলে আছ মোদের কাছে
তোমার স্মৃতি ফুলের মত ছড়িয়ে নিতি আছে।
কার্য্য তোমার করব মোরা সমস্ত প্রাণ দিয়ে—
দেব-সাহিত্যের উন্নতি হো'ক তোমার আশীষ নিয়ে।

—সচিত্র নূতন সংস্করণ—

ভোরের আলো







শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

—মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রকাশক—শ্রীঅমূল্যরতন বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালক—**দেব-সাহিত্য-কুটীর**
৫৪।৭, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

২৯১

প্রথম সংস্করণ
১৩৩৮

প্রিণ্টার—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৬নং চালতা বাগান লেন, কলিকাতা

প্রীতি-উপহার



ভোরের আলো

১

অপূর্ব্বর সহিত যতীশের অবস্থার তুলনা কোন ক্রমেই করা চলিত না, তবু অনেক ঝড়-ঝাপ্‌টা, অনেক মান-অভিমান ও বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়াও সুদীর্ঘ কাল তাহাদের বন্ধুত্বটা টিঁকিয়াই আছে! অনেক-বার কলহের মুখে মনে হইয়াছে, এত দিনের গ্রন্থি এ'বার বুঝি সত্য সত্যই ছিঁড়িল, তারপর কোথা দিয়া, কেমন করিয়া যে উভয়ের আবার মিলন হইত—সে এক আশ্চর্য্যের বিষয়!

সুদীর্ঘ কাল বলিলাম—সেটা কেবল কথার খাতিরেই নয়, সত্যই বহু দিন। সেই পাঠশালায় তাল-পত্রে অক্ষর বুলাইতে বুলাইতেই একদিন এ উহাকে দেখিয়া—নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল!

তারপর বহুদিন গেছে।

—পাঠশালা হইতে স্কুল এবং স্কুল ছাড়িয়া কলেজ—এতকাল উভয়ে এক সঙ্গেই কাটাইয়া দিল।

এম-এ, পরীক্ষা চুকিয়া যাইতেই অপূর্ব্ব বলিল—আমি চঞ্চল হে—আমি উন্মনা! আমি সুদূরের—পিয়াসী।

যতীশ বলিল—সে সুদূর কতদূর? খালধার লিলুয়া নয়ত?

অপূর্ব্ব বলিল—রামঃ! বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্দী-শালা থেকে ছাড়া পেয়ে—আমার মন কত পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে গেল তার ঠিক ঠিকানাই নেই! আর তুমি বলচ—নাঃ,—তুমি মানুষ হত্যা করতে পার।

—তবু কতদূর তোমার যাত্রা, শুনিই না।

অপূর্ব্ব বলিল—যেতে চাই অনেক দূর—ফিন্‌ল্যাণ্ড বা কামস্কাট্‌কাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু বাপ মা তাতে আপত্তি করতে পারেন, তাই আপাততঃ দার্জ্জিলিঙেই যাব ঠিক করলাম!

—বড্ড হ্যাকনিড্‌।

—তা' হ'ক। ওটা সবাই দেখেচে, না ঘুরে এলে আর মান থাকে না। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

যতীশ বলিল—সম্ভব হ'বে না।

—কেন শুনি?

—নতুন কিছুই বলবার নেই। ট্যুশনি করে লেখাপড়ার খরচ চালাই—বাবা যে কটা টাকা পেন্সন পান তাতে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জোগাড় হবে এই মাত্র।

—এ সব আমি জানি। তবু তোমায় যেতে হ'বে, আমি তোমায় মিস্‌ করতে পারি না।

—তা ছাড়া, বাবা মত দেবেন কিনা তাও সন্দেহের বিষয়।

—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। আমি আজই তোমাদের ওখানে গিয়ে তাঁর অনুমতি-পত্র নিয়ে আসব। টাকা-কড়ির জন্যে তোমার এতটুকু উদ্বিগ্ন হ'বার দরকার নেই, Leave it to me.

—সেটা গোড়াতেই অনুমান করেছি। কিন্তু, সত্যিই এতটা সুবিধে নিতে আমার লজ্জা হয়।

—ওটা দুর্ব্বলতা; হোটেলের জান্‌লা দিয়ে যখন ভোরের কুয়াসাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘাকে চোখে পড়বে, তখন সে কথা মনেই থাকবে না।...তবে আমার দিক থেকে তোমায় সঙ্গে রাখবার একটা মহা অসুবিধে আছে হে!

—সে অসুবিধেটা কি?

অপূর্ব্ব বলিল—ভারি গুরুতর। তোমাতে আমাতে—একটা বড় আয়নার সামনে পাশাপাশি দাঁড়ালেই বুঝতে পারবে, ভয়ের কারণ আমার কোথায়! সত্যিই যতীশ, ঈশ্বর যদি আমায় তোমার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্যও দিতেন, তাহলে, দার্জ্জিলিংএর সমস্ত বরফ আমি গলিয়ে দিয়ে আসতে পারতাম!

অপূর্ব্ব হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

যতীশ বলিল—তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই। তোমার মত টাকা থাকলে, আমিও কলকাতায় বসে দার্জ্জিলিংএর সুখ অনুভব করতাম। কিন্তু তা যখন হয় নি—

—তখন 'যা ছিলাম তাই রয়ে গেলাম, চটে-মটেই ত?' কি বল? অপূর্ব্ব বলিল।

ইহার পর দুই বন্ধু মিলিয়া যাত্রা সম্বন্ধে আরও কত বিচিত্র জল্পনা করিল, আবশ্যকীয় জিনিস পত্রের একটা তালিকা প্রস্তুত হইল, কবে সেগুলি কিনিয়া ফেলা আবশ্যক তাহাও ঠিক হইয়া গেল।

যতীশ পছন্দ সই পোষাক-আষাক ক্রয়ে সুপটু।

তার হাতে কতকগুলি টাকা দিয়া অপূর্ব্ব বলিল—এই গুলি কালকের মধ্যে কিনে আনা চাই।

যতীশ জানাইল, পিতার মত না হইলে সে এতখানি পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত নয়।

অপূর্ব্ব বলিল—ভয় নেই ভীরু—ভয় নেই। আমাকে শিখণ্ডী করে আজ সন্ধ্যায় তুমি বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হ'বে। তাও যদি না পার, I will ball the cat.

২

মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-সংসার যেমন হইয়া থাকে, যতীশদেরও তাই। যতীশের জননী বৎসর কয়েক পূর্ব্বে স্বর্গীয়া হইয়াছেন, পিতা রাধাবল্লভ পেন্সনের সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ পক্ষাঘাতে গিয়াছেন পঙ্গু হইয়া।

যতীশরা তিন ভাই। দুইটী এখনও খুবই ছোট, স্কুলে পড়িতেছে। তিনটী ভাইয়ের একটী মাত্র বোন্ লক্ষ্মী ; আদর তাহার যতটা পাইবার কথা, তাহার শতাংশের একাংশও তার অদৃষ্টে জুটে নাই। বিবাহের বয়স হইতে খুব বেশী দেরী নাই—কিন্তু সে দিকে মেয়ে বা মেয়ের বাপ কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাটিতে দ্বিতীয় কোন স্ত্রীলোক না থাকায় রাঁধুনীও রাখিতে হইয়াছে, বাটী ভাড়াও আছে। ফলে চারিদিক দিয়া খরচ আর খরচ—আয়ের মধ্যে অকাল-বৃদ্ধ রাধাবল্লভের পেন্সনের কয়েকটা টাকা।

বাড়ীতে তিনটী মাত্র ঘর—পাকশালা ছাড়া। একটীতে যতীশ পড়াশুনা করে, একটী রাধাবল্লভের, অপরটীতে আর সকলে।

মধ্যবিত্ত সংসারে সব চেয়ে বড় মুস্কিল এই যে, তার অবস্থাটা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে ঠিক যেন ত্রিশঙ্কুর মত! আয়ের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও ঠাট-ঠকস ঠিক রাখিতেই হয়।

এই ছোট্ট সংসারেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

রাধাবল্লভ তাঁহার ঘরটীতে বসিয়া বসিয়া কাগজ পড়েন, খাবার সময় খান, বাকী সময়টা নিদ্রা।—নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, কোন উপদ্রব নাই।

যতীশের উপর সংসারের ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত মনে তিনি পরপার যাত্রার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মী লণ্ঠন জ্বালিয়া দিয়া গেলে তিনি পড়িতে বসিয়াছেন, এমন সময় অপূর্ব্বকে সঙ্গে লইয়া যতীশ ঘরে ঢুকিল।

অপূর্ব্ব ইতিপূর্ব্বেও আসিয়াছে, চা খাইয়া, রাধাবল্লভের সঙ্গে দেশ ও দশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া চলিয়া গেছে। মাঝে অনেকদিন আসে নাই।

রাধাবল্লভ বিব্রত হইয়া উঠিলেন। আড়ষ্ট পা টাকে সরাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া বলিলেন—এস বাবা, এস।

তোষকের খানিকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, চাদর নাই। রাধাবল্লভ মনে মনে বিলক্ষণ লজ্জিত হইয়া বলিলেন—বস্‌তে দেবার একটু জায়গাও নেই। এস এস এই খানটাতেই বস।

তিনি পাশের জায়গাটুকু দেখাইয়া দিলেন।

—তারপর পরীক্ষা কি রকম হল? ওরে ও লক্ষ্মী—ঘুমোল বুঝি!...অপূর্ব্বর জন্যে চা করে নিয়ে আয়।

অপূর্ব্ব বলিল—চা খেয়েই এসেছি, ওর জন্যে তাড়া নেই।

অতঃপর পরীক্ষার কথা হইতে রাধাবল্লভদের সময়ের লেখা-পড়ার কথা উঠিল। কোন্ কোন্ ছেলে লেখা-পড়ায় অত্যুৎকৃষ্ট ছিল—এখনই বা তাহারা কোথায় কি করিতেছে—সে সব কথাও আসিয়া পড়িল।

খানিক পরেই লক্ষ্মী চা ও খানিকটা মোহনভোগ লইয়া ঘরে ঢুকিল। অপূর্ব্বকে সে ইতিপূর্ব্বেও দেখিয়াছে, কিন্তু কিছুদিন না আসায়, তাহার পা যেন লজ্জায় একটু অবশ হইয়া পড়িতেছে।

অপূর্ব্ব তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—বাঃ! তুই যে এই ক'দিনে বেশ বড়-সড় হয়ে উঠেছিস!—তা, এসব আবার কি কর্ত্তে?

বড়-সড় হইয়া উঠিবার কথায় বাঙ্গালীর মেয়ে—বাঙ্গালীর মেয়ে কেন, সকল মেয়েরই মাথা আপনার অগোচরেই নীচু হইয়া আসে, লক্ষ্মীরও গেল। ফলে, অপূর্ব্ব যে কথা জিজ্ঞাসা করিল, সেটা তার মনেই রহিল না।

রাধাবল্লভ লক্ষ্মীকে উদ্ধার করিলেন।

—তা হ'ক, ও কিছুই না। কতদিন পরে এলে...ইত্যাদি।

রাধাবল্লভ কতদিন বাহিরের আকাশ দেখেন নাই! নূতন কেহ আসিলেই তাহাকে লইয়া জুড়িয়া দেন যত রাজ্যের গাল-গল্প! যেন লোকের মুখের কথা দিয়াই তিনি বাহিরের পৃথিবীটাকে দেখিয়া লইবেন। আজও নানা কথা উঠিয়া পড়িল। ফলে, লক্ষ্মী বেচারী খানিক বোকার মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া আসিল।

কথায় কথায় রাত হইয়া যায়; কিন্তু আসল কথাটা তখনও পাড়া হয় নাই! অপূর্ব্ব উস-খুস করিতে লাগিল।

রাধাবল্লভ সেটুকু লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—বড্ড বিরক্ত হচ্চ বোধ হয়? কিন্তু রাত এমন কিছুই হয় নি।

—আজ্ঞে না, এমন বেশী কিছুই না, সবে সাড়ে দশটা। কিন্তু, একটা কথা আপনাকে বলবার ছিল—যদি কিছু মনে না করেন—

—ওর আবার মনে করা-করি কি! তুমি ত ঘরের ছেলে—

অপূর্ব্ব বলিল—আমি দার্জ্জিলিং যাচ্ছি—

বাকীটুকু শুনিবার পূর্ব্বেই রাধাবল্লভ বলিলেন—খুব ভাল কথা, এতে লজ্জার কি আছে? আমিও একবার গিয়েছিলাম—বোধ হয়

১৮৮৪ সালে। এক কথায় Splendid—বুঝলে হে!...বিলম্ব করো না, চলে যাও!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, যাব বলেই ঠিক করেচি। তবে, আপনার কাছে একটা অনুরোধ ছিল।

—অনুরোধ,—আমার কাছে! ছি, ছি, বুড়ো মানুষকে লজ্জা দেওয়া হয়। কি বল?

—যতীশকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।

—সে যে অনেক টাকার ব্যাপার! সে সামর্থ্যই বা ওর কোথায়—সংসারই বা দেখবে কে?

অপূর্ব্ব কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—মাস খানেকের বেশী দেরী হ'বে না। আর টাকা কড়ির জন্যে আপনার চিন্তা করবার দরকার নেই, সেটার ব্যবস্থা আমরাই করে নেব।

রাধাবল্লভ বলিলেন—সেটা কি রকম হ'বে? আমি ত' কিছুই বুঝলাম না যতীশ!

যতীশ মাথা নীচু করিয়া বলিল—ও নিজেই সেটা বহন করতে চায়।

রাধাবল্লভ বলিলেন—ছি, ছি...সে কি কখনও হয়,...ও সব খেয়াল ছেড়ে দাও।—অপূর্ব্বর দিকে চাহিয়া বলিলেন—ওতে যে আমার দারিদ্র্যের অপমান করা হয়।

অপূর্ব্ব কিন্তু সে ধার দিয়াও গেল না। বলিল—কিন্তু ওকে না যেতে দিলে যে আমার বন্ধুত্বের দাবীকে অসম্মান করা হয়।

এইভাবে কিছুক্ষণ তর্ক চলিবার পর, রাধাবল্লভকেই হারিতে হইল। ...যাত্রার দিন স্থির হইয়া গেল।

৩

দার্জ্জিলিঙে পৌঁছিয়া দুই বন্ধু দিনকতক খুব উল্লাসের সঙ্গে কাটাইয়া দিল। হঠাৎ মেঘ ও বৃষ্টি, হঠাৎ রৌদ্রের লুকোচুরি দেখিয়া উভয়ে মুগ্ধ হইয়া গেল এবং সকালে দু' পহরে বৃষ্টিতে ভিজিয়া বেড়াইল। তারপর দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি যখন একে একে ফুরাইয়া আসিল, তখন দুই বন্ধুতে বৈচিত্র্যের অভাব অনুভব করিতে লাগিল।

অপূর্ব্ব বলিল—জীবনটা ভারি একঘেয়ে, বুঝলে যতীশ? কিন্তু এ কথা এখানে আসবার আগে, একবারও অনুভব করিনি।

যতীশ বলিল—এতদিন পুঁথি-পত্রগুলো রেখেছিল তোমার চিত্তকে চাপা দিয়ে; আজ তার ঘুম ভেঙ্গেচে—খাদ্য চাই।

অপূর্ব্ব বলিল—চাই ত' বটে, কিন্তু পাওয়া যায় কই? এই দশ-দিন ক্রমাগত পথে পথে ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু এমন একটা দুর্ঘটনাও ঘটল না—যাতে আকাশের রং যায় বদ্‌লে, বাতাসে হঠাৎ বসন্তের আমেজ লাগে! অথচ, নভেলগুলো পড়ে দেখো—কি সব অসম্ভব বাজে কথাই না লিখেচে! বাস্তব আর কল্পনায়—ঐটুকুই তফাৎ!... তুমি কি বল'?

যতীশ বলিল—জীবনটা এতকাল যে ভাবে কাটিয়ে এসেছি, তাতে—রোমান্সের সম্ভাবনা কোন দিন মনে জাগে নি। কঠিন বাস্তব নিয়েই আমার কারবার।

অপূর্ব্ব বলিল—ইডিয়ট্। এই মেঘময় আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে,

বরফের মুকুট-পরা পাহাড়ের দিকে চেয়ে, তোমার এমন কাউকে পাশে পেতে সাধ যায় না, যে তোমাকে—নতুন করে গড়বে, চোখে দেবে—নতুন অঞ্জন বুলিয়ে ?

যতীশ বলিল—হয় বোধ করি। কিন্তু সে-সব বিষয়ে আমি কোন দিন seriously ভেবে উঠতে পারিনি। জীবনটা নেহাৎ গদ্যময়—এইটেই আমার বিশ্বাস জন্মে গেছে।

অপূর্ব্ব বিরক্ত হইয়া একটা চুরুট ধরাইল ও শেলীর কাব্য-গ্রন্থ খুলিয়া তাহাতে মনঃসংযোগের চেষ্টা করিল।

কবি লিখিয়াছে—তটিনীর জল, মাটীর ফুল, আকাশের মেঘ সবাই মিলনের কামনায় ব্যাকুল! নদী-স্রোত চায় বাতাসের মৃদু স্পর্শ, ফুল চায় দখিনার সোহাগ ;...সমস্ত নিখিলের অন্তরে এই কামনার বাণী, মিলনের অভিলাষ!

অপূর্ব্ব বইখানা ছুঁড়িয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল—এদের মত কবি—মানুষকে হত্যা করতে পারে। যে সব কথা আছে মনের অতলে লুকিয়ে—সেইগুলিকে নিয়েই এরা টানাটানি করবে। আমি যদি শেলীকে দেখতাম, তা' হলে বলতাম, কবিতা লিখে তুমি আমাদের অতিষ্ঠ করবার ব্যবস্থা করে গেছো।

যতীশ বলিল—আমার কাছে ম্যাকেভেলীর 'প্রিন্স' আছে, পড়বে ?

অপূর্ব্ব বলিল—কঠোপনিষদ পড়াই এ' অবস্থায় যুক্তি-যুক্ত!

হোটেলের কক্ষে বসিয়া সেদিন দুইটী নব জাগ্রত তরুণ প্রাণ যখন এইভাবে রহস্যালাপে মগ্ন ছিল—মেঘের আড়ালে রহিয়া আর

কেহ বোধ করি তখন একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিলেন! কারণ, ঠিক সেই দিন সন্ধ্যা হইতেই তাহাদের জীবনে এমন একটা বৈচিত্র্যের সূত্রপাত হইল, যে, সারা-জীবনটাতেই তাদের একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল এবং বহুকাল ধরিয়া উভয়কে তাহারই জের টানিতে হইল। এ' কাহিনীর মূল উপাদানও সেইটুকুই।

দুই বন্ধু 'রিঙ্ক' হইতে বায়স্কোপ দেখিয়া ফিরিতেছিল। অতি চমৎকার হইয়াছে বলিয়া সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে করিতে দুইজনে পথ চলিতেছিল। উপরের আকাশ মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া বর্ষণের উপক্রম হইয়াছে, সে দিকে কেহ দৃষ্টিই দেয় নাই।

হঠাৎ যতীশ উপরের দিকে চাহিয়া বলিল—ভয়ানক বৃষ্টি আস্‌চে, তাড়াতাড়ি চল।

রাত্রির অন্ধকারে দূরের অস্পষ্ট পর্ব্বতশ্রেণীর গাম্ভীর্য্য যেন শতগুণ বাড়িয়া গেছে! দুই পাশের আলো পথের উপর পড়িয়া যে মায়াময় ছায়া সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার দিকে চাহিয়া অপূর্ব্ব বলিল—এই অদ্ভূত রাত্রিটীকে—আমি সমস্ত মন দিয়ে অনুভব করতে চাই; তাড়াতাড়ি যাবার ইচ্ছে আমার আদৌ নাই।

তা না থাক্, বৃষ্টি তখনই আসিল—তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিল না। তবে ভিজিবার ভয় কাহারও ছিল না; বর্ষাতি ও ছাতায় সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হইয়া উভয়ে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

হোটেলে পৌছিতে বেশী বিলম্ব ছিল না, হঠাৎ সামনের দিকে চাহিয়া অপূর্ব্ব বলিল—একটী মেয়ে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে এই দিকে আসচে দেখেছ?

—তাই বটে !

দূর হইতে ভাল করিয়া দেখা যায় না বটে, কিন্তু মেয়ে—বলিয়াই মনে হয়।

কাছে আসিতেই দেখা গেল, অপূর্ব্বর ধারণা অভ্রান্ত। জলে মেয়েটীর সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে ;...থর থর করিয়া কাঁপিতেছে বুঝি !

মাথার চুলগুলি জলে ও বাতাসে আলু-থালু হইয়া গেছে—উপরের আকাশের মত !...অপূর্ব্ব ভাবিতেছিল—ছাতাটা 'অফার' করিবে কি না !

যতীশ ভাবিতেছিল—বৃষ্টি বিরাম না মানা পর্য্যন্ত তাঁহাকে তাহাদের হোটেলে গিয়া বিশ্রাম করিতে বলে। কিন্তু সেটা কি খুব ভাল দেখাইবে ? ইঁহার সহিত ইতিপূর্ব্বে কোন দিন দেখা হয় নাই, হোটেলে তাহাদের স্ত্রীলোকও কেহই নাই ! যদি কিছু মনে করেন ?... না কাজ নাই বাহাদুরী করিয়া।

কিন্তু অপূর্ব্ব এত নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিবার পাত্র নয়।

বলিল—Allow me, আপনি যদি অপরাধ না নেন, তা' হ'লে—

অপূর্ব্ব ছাতাটা তাঁহার দিকে বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালীর মেয়ে, বয়স অল্প। দার্জ্জিলিংএ আসুন আর লেখাপড়াই শিখুন—লজ্জা না হইয়া উপায় কি !

মেয়েটী বলিল—না না...আপনাকে যে তাতে ভিজে যেতে হ'বে।

অপূর্ব্ব বলিল—আমার বর্ষাতি আছে, বন্ধুটীর আছে—বর্ষাতি আর ছাতা দুইই। আপনি সে বিষয়ে এতটুকু ভাববেন না। নিজে এই

শীতের মধ্যে ভিজে, পরোপকার করবার বাসনা আমাদের হয় নি

মেয়েটী মৃদু হাসিল—বোধ করি অপূর্ব্বর কথার ধরণে! ক্ষণকাল মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া বোধ হয় ভাবিল—অপরিচিত ব্যক্তির ছাতিটা লওয়া উচিত হইবে কি না; তারপর জিজ্ঞাসা করিল—এটা ফেরৎ পাঠাব কোথায়?

অপূর্ব্ব বলিল—A. Roy. Park Hotel.—এই ঠিকানায়।

মেয়েটী একটী ছোট্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল,—দুই হাত তুলিয়া সসঙ্কোচ একটী নমস্কার! পথের আলোর একটুখানি বুঝি মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল,—দেখা গেল আয়ত দুইটী চক্ষু যেন নীরবে মধু-বর্ষণ করিতেছে।

...অপরিচিতা চলিয়া গেল।

তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে,—বাতাস বহিতেছে। যতক্ষণ দেখা গেল উভয়ে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল!—সত্যই পাহাড়ের উপর বৃষ্টি-মুখর এই রাত্রিটী অকস্মাৎ যেন অপূর্ব্ব—রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে!

অপূর্ব্ব বলিল—এ এক রকম মন্দ হল না যতীশ, ছ' পেন্স সিরিজের বিলিতি উপন্যাসের একটা অধ্যায়ের মত! তবু যা হ'ক, অরুচি কাটল বুঝি!

সে রাত্রে হোটেলের কক্ষে ফিরিয়া দুইজনে যখন আহারাদি সারিয়া শয্যায় আশ্রয় লইল, জানালার কাঁচের শার্শী দিয়া তখনও অবিরাম ধারায় জল গড়াইতেছে! বাহিরে পাইন তরু-শ্রেণী ঝড়ের দোলায় মর্ম্মরিত হইতেছে। দুই জনেই চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল

এবং দুইজনেরই মনে পড়িল, আজিকার ক্ষণ-পরিচিতা সেই তরুণীকে, তাহার কণ্ঠের কল-ঝঙ্কার যেন রজনীর নিবিড়তার মধ্যে রহিয়া রহিয়া সঙ্গীতধ্বনি সৃষ্টি করিতে লাগিল।

সকালে, ১০টা বাজিয়া গেলে অপূর্ব্ব বলিল—না হে, ছাতিটা ফেরৎ পাবার আর কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্চে না; ওটা বোধ হয় আক্কেল-সেলামী স্বরূপ দিতে হ'ল।

যতীশ বলিল—ভদ্র মহিলা সম্বন্ধে তোমার এ রকম ধারণার আমি প্রতিবাদ করি। আমি বললাম, ছাতা তুমি নিশ্চয় ফেরৎ পাবে।

খানিক পরে সত্য সত্যই ছাতি ফেরৎ আসিল। অপূর্ব্ব ভাবিয়াছিল, মেয়েটা নিশ্চয় নিজেই আসিবে, কিন্তু আসিল তাহার বেয়ারা, সঙ্গে ছোট একটুক্‌রা চিঠিও ছিল—

মিঃ রয়,

বেয়ারার হাতে আপনার ছাতাটী ফেরৎ পাঠালাম। আশা করি, এ জন্য আমায় অপরাধী করবেন না। বাবা বলছিলেন, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে পারলে তিনি খুব খুসী হ'বেন। আপনাদের অসুবিধা না থাকলে, আজ সন্ধ্যায় আমরা হোটেলে অপেক্ষা করব।

ইতি—ইলা।

বেয়ারাকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া, অপূর্ব্ব ছুটিয়া আসিল ভিতরে। বলিল—কি জবাব দেব বলে দাও।

যতীশ বলিল—এই রকম একটা কিছুই ত প্রত্যাশা করছিলে এসে অবধি! লিখে দাও—আপনি না বললেও আমরা যেতুম।

অপূর্ব্ব বলিল—পাগল, তাই আবার লেখে নাকি ! কিন্তু সত্যি ভাই, যাবার সাহস আমার নেই।

যতীশ বলিল—মুখেই কেবল ব্রাভাডো ? এত উৎসাহ এক নিমিষে নিভে ছাই হয়ে গেল !...

শেষ পর্য্যন্ত যাওয়াই স্থির হইল। বেয়ারা সেই মর্ম্মে জবাব লইয়া চলিয়া গেল। অপূর্ব্ব যতীশের পিঠ চাপড়াইয়া গান ধরিল—

"Who knows what happens in the yonder wood"

যতীশ বিরক্ত হইয়া বলিল—চুপ কর ইডিয়ট্।

৪

ইলার পিতা আনন্দ চৌধুরী বিলাতে গিয়াছিলেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ব্যারিষ্টার হইয়া। নামের শেষে উপাধিটা জুটিয়াছিল, বটে, কিন্তু আদালতের সহিত তাঁহার আজও পরিচয় হয় নাই। বাপ-পিতামহের সঞ্চিত অনেকগুলি টাকা ব্যাঙ্কের খাতায় জমা হইয়াছিল, তাই দিয়া এতকাল অনায়াসে চালাইয়া আসিতেছেন এবং বাকী জীবনটাও ঠিক সেই ভাবে কাটিবে।

ইলার মায়ের মৃত্যুর পর আনন্দ চৌধুরী অকালেই বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন ; দেহে ব্যাধির বালাই বিশেষ কিছুই নাই, কিন্তু মন গিয়াছে ভাঙ্গিয়া। তাই মন-গড়া কতকগুলি অসুখ সৃষ্টি করিয়া, বৎসর কাল তিনি এই শৈল-শিখরেই পড়িয়া আছেন।

ইলা তাঁহার একমাত্র কন্যা। ইলাকে তিনি লেখা পড়া শিখাইয়াছেন নিজেই। স্কুলের সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় নাই। কাজেই কলিকাতা ছাড়িলেও বাবার কাছে তাহার লেখাপড়া সমান ভাবেই চলিতেছে।

পরের ছাতা লইয়া মেয়ে যখন সে রাত্রে বাড়ী পৌঁছিল, আনন্দ তখন বিছানায় শুইয়া সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। ইলা চুপি চুপি নিজের ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছিল ; আনন্দ আড়-চোখে চাহিয়া লইয়া বলিলেন—এ' দিকে আয়, এ' দিকে আয়! এত

রাত্তির পর্য্যন্ত জলের মধ্যে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলি? অসুখ-বিসুখ একটা না করে আর ছাড়বিনে, পোড়ার মুখী!

ইলা বলিল—পোড়ারমুখীই ত! আজ কিন্তু সত্যি অসুখের জোগাড় করে আসছিলাম, এক ভদ্রলোক দয়া করে তাঁর ছাতা...

সব কথা শুনিয়া আনন্দ বলিলেন—আজকাল ছেলেরা খুব ফরওয়ার্ড হচ্ছে, কি বলিস ইলা?

ইলা বলিল—আমি কি জানি!

আনন্দ বলিলেন—আমার ত তাই মনে হয়। বিশ বছর আগে—ছেলেরা এত চট্‌পটে ছিল না। মেয়েদের দেখে লজ্জায় তারা নবোঢ়ার মত রাঙা হয়ে উঠত! ছেলে দুটিকে আমার দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে! ...আচ্ছা, একদিন যদি তাদের এখানে এনে আলাপ করা যায়...

ইলা বলিল—তোমার ইচ্ছে, আমি জানি না।

আনন্দ বলিলেন—আমার ইচ্ছে হলেই তোমারও ইচ্ছে—সে কি আর জানি না? আচ্ছা, তুমি বেয়ারাটাকে দিয়ে একটা খপর দাও...

সন্ধ্যার সময় যতীশ ও অপূর্ব্ব দুই জনেই নিমন্ত্রণ রাখিতে উপস্থিত হইল। যতীশ কিছুতেই আসিতে চাহে নাই, অপূর্ব্বর পীড়া পীড়ির জন্যই কেবল...

পরিচয়ের ও ধন্যবাদের পালা শেষ হইয়া গেলে, আনন্দ চৌধুরী তাহাদের লইয়া গল্প-গুজবে ডুবিয়া গেলেন।

কিন্তু যতীশ বেচারীর চুপ করিয়া থাকাই অভ্যাস, তাই সে মুখ বুজিয়া বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে কে জানে!

ইলা যতীশের পাশে দাঁড়াইয়া বলিল—আপনি যে বড় ওঁদের আলোচনায় একটুও যোগ দিচ্ছেন না?

অপূর্ব্ব ইলার কথাটুকু শুনিয়া লইয়া বলিল—ও আপনার সঙ্গে এর চেয়ে লোভনীয় জিনিসে যোগ দিতে পারে—যদি অনুমতি দেন।

আনন্দ বলিলেন—বেশত, বেশত...কিন্তু সে জিনিসটা কি অপূর্ব্ববাবু?

অপূর্ব্ব বলিল—গান।

—গান খুব ভাল জিনিস, ছেলে বেলায় খুব চর্চ্চা ছিল। তা যতীশবাবু যদি বিরক্ত না হন—

যতীশ কিন্তু কিছুতেই সম্মত হইল না, বলিল—তাড়াতাড়ি কিসের?

অপূর্ব্ব অলক্ষ্যে একবার ইলার মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—ঐশ্বর্য্য যার যত বেশী, সেই হয় তত কৃপণ!, বিধাতা নিতান্ত বায়স-কণ্ঠ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছেন, নইলে—এই পাহাড়ের বরফ গলিয়ে আমি সুরের স্রোত বইয়ে দিতাম।

আনন্দ বলিলেন—ঠিক, সঙ্গীত একটা মস্ত ঐশ্বর্য্য!...তা হ'ক আর একদিন হ'বে; লজ্জা ভাঙ্গুক। কিন্তু হ্যাঁ, মুসোলিনির রোম অধিকার নিয়ে আমাদের কি তর্ক চল্‌ছিল?

আবার দুইজনে মুসোলিনির জীবন-কাহিনীর মধ্যে ডুব দিলেন।

যতীশ ভারি বিরক্তি বোধ করিতে লাগিল। ব্রাহ্ম-পরিবারের ছেলে হইয়াও কোন দিন অপরিচিত লোকের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিবার সুযোগ বা সৌভাগ্য তাহার হয় নাই—যতীশের কপাল ঘামে ভিজিয়া গেল।

ইলা জিজ্ঞাসা করিল—অপূর্ব্ববাবুর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব অনেক দিনের, নয় ?

—হ্যাঁ বহুকালের।

—একই কলেজে পড়তেন বোধ হয় ?

—একই কলেজে, এক সঙ্গে এবং এক বিষয়ে।

সেই দিন রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সকলের গল্প চলিল। আকাশে জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, জানালার মধ্যে দিয়া আলোকিত পর্ব্বত-চূড়া চোখে পড়িতেছিল, রাত্রির গতির দিকে দৃষ্টি দিবার খেয়াল কাহারও ছিল না।

তবে আসিবার খানিক আগে আনন্দর কথায় ইলাকে একটা গান গাহিতে হইল। কোন যন্ত্রের সাহায্য নাই, এতটুকু কৃত্রিমতার প্রশ্রয় নাই,—স্বচ্ছন্দ-গতি জল-স্রোতের মত তাহা কল কল স্বরে ছুটিয়া গেল! ঘরের সমস্ত হাওয়া যেন সুরের স্পর্শে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল,...অনেকগুলি বেণু-বীণা যেন এক সঙ্গে বাজিয়া উঠিয়াছে!

গান শেষে আনন্দ বলিলেন—আমারই কাছে ওর গানের হাতে-খড়ি, কিন্তু আজ ও আমাকে অনেক পেছিয়ে ফেলে গেছে!

ইলা অপূর্ব্বর দিকে চাহিয়া বলিল—বিশ্বাস করবেন না কখনো। বাবা আজও যে চমৎকার বীণা বাজাতে পারেন, তা শুনলে আর ওঠ্‌বার কথাই আপনার মনে থাকবে না। মা' মারা যাবার পর থেকে—

হঠাৎ আনন্দ বিব্রত হইয়া বলিলেন—আঃ, কি করিস্ তার ঠিক নেই! ওসব, বুঝলে কিনা—কিছুই না! একা একা সময় কাটাবার জন্যে...তা সে আর একদিন হ'বে, আর একদিন হ'বে—

হঠাৎ মনে হইল, প্রৌঢ়ের আপাত-প্রফুল্ল স্বভাবের মধ্যে কোথায়

যেন একটু বেদনার রেশ বাজিতেছে; পর্ব্বত-চূড়ায় বসিয়া মহেশের মত তিনি যেন কোন উমার আগমন-প্রতীক্ষায় কাল গণিতেছেন।

বিদায় লইয়া অপূর্ব্ব ও যতীশ যখন বাহির হইল, পথে তখন লোক্-জন নাই—দূরে ও নিকটে শুভ্র জ্যোৎস্না প্রকাণ্ড একটা রেশমী উত্তরীয়ের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে, মাথার উপরে অতন্দ্র চাঁদ!

...হোটেলের বিছানায় পড়িয়া, অপূর্ব্ব বলিল—চমৎকার লোক আনন্দবাবু, কি বল?

অপর ব্যক্তি উত্তর দিল না।

—ঘুমুলে না কি?

—না—চেষ্টা করচি।

—ইলাও চমৎকার মেয়ে! কোথাও একটু উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, তা বলে অকারণ সঙ্কোচও তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। লেখাপড়াও শিখেচে বলে মনে হ'ল।—কি বল?

—তুমি নিতান্ত ভুল ধারণা কর নি।

—ব্যাপার কি!—হঠাৎ এত গম্ভীর! গান শুনে বিরক্ত হলে নাকি?

—মোটেই না।

—তবে?

—ভাবচি নিজের ভবিষ্যতের কথা—সংসারের কথা।

হঠাৎ দার্শনিক তত্ত্ব কেন? সংসারের চিন্তা এখন না করলেও চলবে;

যতীশ চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব্ব আরও খানিকটা আপন মনেই বকিয়া বকিয়া চাদর মুড়ি দিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ঘুম তখন কোথায়?

৫

সকালে উঠিয়া ইলা বাবার পাশে বসিয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলিল—অপূর্ব্ববাবু বড্ড বেশী কথা বলেন, নয় বাবা ?

আনন্দ বলিলেন—কেন ? অপূর্ব্ব খাসা ছেলে—অগাধ পড়াশুনো ! ওর পাণ্ডিত্য দেখে মনে মনে আমি তারিফ্ করছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি ইলা, যতীশ ছেলেটীকে আমার তেমন স্মার্ট বলে মনে হয় না।

ইলা বলিল—এঁরা দু'জনেই এক সঙ্গে পড়েচেন, কিন্তু যতীশবাবুই হয়েছেন বরাবর ফার্ষ্ট।

—কে তোমায় এ'কথা বল্‌লে ?

—অপূর্ব্ববাবুই এক সময় আমায় বলেছেন।

—After all, বুঝলে ইলা, অপূর্ব্বর মত ছেলেই আজ দরকার—যে অকারণ লজ্জায় নুয়ে পড়ে না, মানুষের সঙ্গে সহজ আত্মীয়তা পাতাবার সাহস রাখে।

ইলা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি কি অপূর্ব্ব বাবুর নিন্দে করছি নাকি ?

—তা নয়, তা নয়। কিন্তু, তুমি চললে কোথায় ? আমার পাইপ্‌টায় একটু তামাক ভর্ত্তি করে আনো, আর বেয়ারাটাকে একবার ডাক।

—বেয়ারা আবার কি করবে ?

—আজ আবার ওঁদের আসতে বলে আসুক। একা একা সারা দিন শুয়ে-বসে আমি একেবারে Exhausted ! পায়ে ক'দিন থেকে... তবু যদি ওঁরা আসেন, তা'হলে সন্ধ্যে বেলাটা...

ইলা হাসিয়া ফেলিল। বলিল—পায়ের ব্যথা তোমার কবে সেরে গেছে, বক-বক করতে চাও তাই বল না !

ইলা চলিয়া গেল। আনন্দ হাসিলেন।

সন্ধ্যার সময় আসিল অপূর্ব্ব একা ! লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত, তার কেশের পারিপাট্য আজ একটু বেশী !

আনন্দ বলিলেন—তোমার বন্ধুটী কোথায় রইলেন অপূর্ব্ব ?

অপূর্ব্ব কহিল—ওটার কথা আর বলবেন না ! বড্ড বেশী Sentimental ! হঠাৎ সংসারের ভাবনা জগদ্দল পাথরের মত ওর মাথায় চড়ে বসেচে—কিছুতেই তাড়ানো গেল না ! এখন গেলে দেখতে পাবেন, ম্যাকেভ্যালীর 'প্রিন্স' সম্বন্ধে হয়ত থিসিস্ লিখবার চেষ্টা করছে।

আনন্দ বলিলেন—লেখা-পড়ায় ভারি ঝোঁক দেখচি ! কিন্তু খুব বেশী চিন্তা করাও আবার ভাল নয় ; ওঁকে বারণ করে দিও, এ থেকে পরে dyspepsiaর উৎপত্তি হতে পারে।

অপূর্ব্ব হাসিয়া ফেলিল।

ইলা বলিল—তোমার কেবল অসুখের ভাবনা বাবা ! যারা বেশী লেখাপড়া করে, তারা সবাই বুঝি dyspeptic ?

—না না, কথাটা ঠিক তা নয়। তবে ওটা একটা গৌণ কারণ—ডাক্তারেরা বলে থাকেন।—কিন্তু, চা দিতে বল বেয়ারাটাকে, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

অপূর্ব্ব জানাইল—আদৌ বিলম্ব হয় নাই, তিনি অকারণ ব্যস্ততা প্রকাশ করায় সে বিলক্ষণ লজ্জা বোধ করিতেছে।

তা করুক, আনন্দ চুপ করিবার লোক নন! বারম্বার চীৎকার করিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে চা আনাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। পেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিলেন—কিন্তু আমাদের একটা মস্ত ভুল হয়ে যাচ্চে ইলা!

ইলা বলিল—তা হ'ক্, আমি গান গাইতে পারবো না।

আনন্দ বলিলেন—আমি বুঝি তোমাকে কেবল গানই গাইতে বলি? বলছিলুম, একদিন তুমি নিজের হাতে খাবার তৈরী করে এঁদের খাইয়ে দাও! একটু লোভ না দেখালে এঁরাই বা আসবেন কেন, এই বুড়োরই বা সময় কাটবে কি করে?

বলিয়া আনন্দ নিজেই হাসিয়া উঠিলেন। অপূর্ব্বও সে হাসিতে যোগ দিল। দম্‌কা বাতাসের মত বন্ধনহীন আনন্দের হাসি! একটু থামিয়া বলিলেন—তুমি জান না অপূর্ব্ব, রান্নায় ওর আশ্চর্য্য দখল!—'গোয়ানিজ' কুক্‌গুলোকে ও অনায়াসে হারিয়ে দিতে পারে।

অপূর্ব্ব বলিল—আশা করি অচিরেই তার প্রমাণ পাবো।

আনন্দ উল্লসিত হইয়া টেবিলে একটা চাপড় দিয়া বলিলেন—নিশ্চয় পাবে, কালই পাবে।...ইলা—

ইলা লজ্জিত কণ্ঠে বলিল—আমার রান্না তোমার ভাল লাগে, কিন্তু সবাই যে তোমার রুচি নিয়ে—

আনন্দ বলিলেন—আমি বাজী রাখতে পারি অপূর্ব্ব, এ' বুড়োর রুচি কুরুচি নয়। তোমরা একদিন খেয়ে দেখ—যদি অরুচি না ছাড়ে, তা হ'লে এত গুলো দিন আমার পৃথিবীতে বাস করাই মিথ্যে!

ইলা ঘাড় ঘুরাইয়া বলিল—অমন করলে কিন্তু কখ্‌খনো আমি রাঁধবো না। কিম্বা এমনি ঝাল দেব, যে কাস্‌তে কাস্‌তে তোমার ঘুম হ'বে না।

—বেশ, তার জন্যেও আমি তৈরী। সে তুমি কখনোই পারবে না। হাজার হ'ক বুড়ো বাপ ত বটে! কিন্তু, হ্যাঁ—সে দিন তোমার বন্ধু ডক্টর Jhonsonটীকেও নিয়ে আসা চাই—অতি অবশ্য! বাইশ চব্বিশ বছরের ছেলে, দার্জ্জিলিংএ এসে সন্ধ্যে বেলাটা কি করে ম্যাকেভেলী পড়ে কাটাতে পারে, আমি কেবল তাই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্চি!

অপূর্ব্ব বলিল—আন্‌বার যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কিন্তু সে দিন—কিছু যদি না মনে করেন, তা হ'লে আপনার বীণার আলাপও একটু...

আনন্দ বলিলেন—আলাপ না ছাই! কতকাল ওসবের আর চর্চ্চাই করিনি, মনে আছে কিনা তাই বা কে জানে! তা' হ'ক, তোমার বন্ধুটীকে যদি কাল আন্‌তে পারো, আর তিনি যদি তাঁর গান শোনাতে রাজী হ'ন্, তা হ'লে না হয় একবার—

ইলার মুখ খুসীর আলোয় ভরিয়া উঠিল! বলিল—সেই খুব চমৎকার হ'বে বাবা! তোমার বীণার আলাপ আর যতীশ বাবুর গান, fine প্রস্তাব!

আনন্দ পাইপের ধোঁয়া উদ্গীরণ করিতে করিতে বলিলেন—ভয় নেই, তুমিও বাদ যাবে না। রান্না করতে হ'বে বলে গান গাইব না—এটা কোন যুক্তিই নয়!

অপূর্ব্ব বলিল—কেবল আমি হতভাগ্য নির্ব্বোধের মত বসে থাকবো!

আনন্দ কহিলেন—কথ্খনো না! সবাইকেই যে কণ্ঠ দিয়ে গাইতে হ'বে এমন কোন মানেই নেই। কেন, তোমাদের কবিই ত' বলেচেন, 'একাকী গায়কের নহে ত' গান—!' গান সম্বন্ধে এত বড় সত্যি কথা আর বলা হয় নি! যেখানে শ্রোতা নেই—সেখানে সঙ্গীতের মত বিড়ম্বনা আর নেই! তুমি তোমার নিঃশব্দতা দিয়েই আসরকে বাঙ্ময় করে তুলতে পারবে।

পরদিন অপূর্ব্ব যতীশকে ও-বাড়ীর নিমন্ত্রণের কথা জানাইলে, যতীশ বলিল—দেখ অপূর্ব্ব, যার যেটা অধিকার-সীমার বাইরে, সেখানে তার পা দেওয়া অনুচিত, এই আমি জানি। তুমি একাই যাও, আমি তাতে কিছু মাত্র দুঃখ করব না।

অপূর্ব্ব বলিল—ভাব-প্রবণতারও একটা মাত্রা আছে—স্বীকার কর ত? আনন্দ বাবুকে আমি কথা দিয়ে এসেছি, তুমি না গেলে আমারও আজ যাওয়া হ'বে না।

খানিক তর্ক-বিতর্কের পর এবারও যতীশকেই হার মানিতে হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দুইজনে ইলাদের বাড়ী গিয়া পৌছিল।

ইলাই অভ্যর্থনা করিল।

—কাল এলেন না যে?

যতীশ বলিল—না, আজই এলুম।

উত্তর শুনিয়া ইলা বোধ করি সন্তুষ্ট হইল না। মুখ ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—চলুন অপূর্ব্ববাবু—বাবার ঘরে,...এখুনি আবার বাবুর্চ্চিটাকে মশলার পরিমাণ দেখিয়ে দিতে হ'বে।

ইলার বেশে আজ পারিপাট্য নাই, সাদা-সিধা একখানি শাড়ী—এখানে-সেখানে হলুদ ও জাফ্‌রাণের ছোপ্ লাগিয়াছে, চুল গুলি অযত্ন—অবিন্যস্ত!

অপূর্ব্ব মুগ্ধ হইয়া গেল!

আনন্দ বলিলেন—লেখা-পড়া খুব ভাল, কিন্তু তার অতিটা কিছু নয়। সন্ধ্যের সময় একটু বেড়ানর অভ্যেস স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল—মনের পক্ষেও খারাপ নয়। তুমি নাকি ম্যাকেভেলীর ওপর একটা থিসিস্ লিখ্‌চ যতীশ?

যতীশ বলিল—ইচ্ছে আছে, কিন্তু নানা কারণে তা হয়ে উঠচে না।

অপূর্ব্ব বাধা দিয়া বলিল—থিসিসের কথা একটু থাক্ আনন্দ-বাবু—কাল যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—

আনন্দ বলিলেন—মনে আছে। কিন্তু তাড়া কিসের? রাত্রি আর একটু গাঢ় হ'ক, জ্যোৎস্না উঠুক—

তাহাই হইল। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় গানের আসর জমিল।

ইলা বলিল—যতীশবাবুকে গান গাওয়াতে যেন ভুলে যেও না বাবা!

—সে কি ভোলবার জিনিস মা!—আনন্দ বলিলেন।

পীড়াপীড়ি করিয়া লাভ নাই। যতীশ গাহিতে সম্মত হইল এবং এক সময় তাহা শেষও হইয়া গেল। কিন্তু শেষ হইলেও, তাহার যেন শেষ নাই। বাতাসে তাহার রেশ ভাসিয়া বেড়ায়!

আনন্দ ভাবাবেশে চুপ করিয়া রহিলেন এবং যতীশ ইলাকে গাহিতে অনুরোধ করিলে সে বলিল—এরপর গান গেয়ে impress করবার ক্ষমতা আমার নেই। বাবাকে বলুন—

আনন্দ বলিলেন—না, চমৎকারই বটে! বুড়োর কাঁপা হাতে কি আর সে শক্তি আছে, যে, যতীশকে ছাড়িয়ে যাব? তুমিই গাও ইলা!

সে দিন রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত গান বাজনা চলে। সন্ধ্যাটি অত্যন্ত বিচিত্রতার মধ্যে অতিবাহিত হওয়ায় আনন্দ খুসী হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার বীণার আলাপ শুনিয়া দুই বন্ধু মোহিত হইয়া গিয়াছে।

তারপর আহারের পালা।

অপূর্ব্ব কি করিয়া ইলার রন্ধন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিবে তাহা যেন আর ভাবিয়াই পায় না। থা'ক আর ফেলিয়া রাখুক, প্রত্যেকটী জিনিষ একাধিক বার চাহিয়া চাহিয়া বাবুর্চ্চিকে অস্থির করিয়া তুলিল।

যতীশ মুখে কোন উচ্ছ্বাসই প্রকাশ করিল না বটে, তবে প্রত্যেকটী জিনিস তার মনে ও মুখে অজস্র মধু-বর্ষণ করিল!—ইলা নিজে রাঁধিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে ইলা বলিল—অপূর্ব্ব বাবু, আপনি ত' রান্নার প্রশংসা করে অতিষ্ঠ করে তুললেন, কিন্তু আপনার বন্ধুটীর বোধ হয় ভাল করে খাওয়াই হ'ল না।

যতীশ বলিল—সে কি! প্রত্যেকটী জিনিষ আমি তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েচি। মুখে কিছু না বললেও ডিসে তার প্রমাণ রয়েচে—প্রত্যেকটীই শূন্য। এত ব্যস্ত ছিলাম, যে, মনোভাব প্রকাশের অবসর পাই নি।

কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। অপূর্ব্ব রান্নার প্রশংসা করিয়াছে যতখানি, তার সিকিও খায় নাই।

আনন্দ বলিলেন—এ দিক দিয়ে যতীশই কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দিয়েচেন। অপূর্ব্ব কথা বলতে গিয়ে আসল কাজটাই একরকম ভুলে গেছেন।

সবাই হাসিল।

ফটকের কাছে আসিয়া আনন্দ বলিলেন—কাল থেকে কিন্তু দুই জনেরই আসা চাই, নইলে আমরা দু'জন ভয়ানক রাগ করব।

হঠাৎ যতীশ বলিল—আমি কালই কলকাতায় ফিরব, সুতরাং—

যতীশের কলিকাতায় ফিরিবার কথা অপূর্ব্ব পর্যান্ত ইহার আগে শোনে নাই—সবাই গেল আশ্চর্য্য হইয়া!

তিনটী কণ্ঠ প্রায় একই সঙ্গে প্রশ্ন করিল—কেন—কেন? এত হঠাৎ?

যতীশ বলিল—ঠিক হঠাৎ নয়, এক পক্ষের মধ্যে ফিরবার কথা ছিল—

অপূর্ব্ব বলিল—বিশ্বাস করবেন না; একটা নতুন খেয়াল নিশ্চয় ওর মাথায় প্রবেশ করেচে, নইলে যাবার কথা ও আজ এখানে আসবার সময়েও আমায় বলে নি।

যতীশ বলিল—এই খানে এসে কথাটা মনে পড়ল। তা ছাড়া নিজেরও আমার একটু দরকার ছিল।

আনন্দ বলিলেন—ও কিছু নয়। এমন হঠাৎ যাওয়ার কোন মানেই হয় না। নিশ্চয় সেখানে গিয়ে থিসিস্ লিখতে আরম্ভ করবে।

যতীশ বলিল—না তার এখনও অনেক দেরী। সমস্ত বই এখনও

সংগ্রহ করে উঠতে পারি নি। যাওয়া আরও দরকার অনেকটা এই কারণেই।

অপূর্ব্ব ভয়ানক চটিয়া উঠিল। বলিল—এতদিনেও তোমাকে বুঝতে পারলুম না—আশ্চর্য্য!

যতীশ বলিল—ছেলে-মানুষী ক'র না অপূর্ব্ব। আমার থাকা কিম্বা যাওয়ার কোন্‌টা বেশী প্রয়োজনীয়, সেটা তোমার চেয়ে আমারই ভাল বোঝা সম্ভব।

আনন্দও দুই চারিবার আপত্তি করিলেন; ভাবিয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে গানের আসর বসিবে, সন্ধ্যার ক্লান্তি এমনি আনন্দ ও উল্লাসের মধ্যে ডুবাইয়া দিবেন।—সে সব আর হইল কই! ছেলেটীকে তিনি বুঝিতেই পারিলেন না।

বাবার আড়ালে দাঁড়াইয়া ইলা কিন্তু একটী কথাও বলিল না; তবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত, ওর চোখের তারা দু'টী যেন ছুরির ফলার মত জ্ব'লিয়া উঠিতেছে—যেন যতীশের উপর তাহার ক্রোধের আর অন্ত নেই!

কিন্তু সে কথা কেউ জানিল না। আনন্দ, অপূর্ব্ব, এমন কি যতীশও না।

৬

অপূর্ব্ব একাই দার্জ্জিলিঙে রহিয়া গেল।

—ইলার হাসি—গান, আনন্দর সুমধুর আলাপ-আলোচনা—পার্ব্বত্য দেশের অপরূপ শোভা ও সৌন্দর্য্য তাহার মনে অননুভূত রহস্যের জাল বুনিতে লাগিল। ভাগ্যে সে রাত্রে তাহারা পথে বাহির হইয়াছিল, ভাগ্যে সহসা বৃষ্টি নামিয়াছিল, তাই ত' আজ ইলার সঙ্গে তার এই নিবিড় পরিচয়! অপূর্ব্ব মনে মনে সেই শুভ-মুহূর্ত্তটী স্মরণ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দেয়।

—কী চমৎকার মেয়ে—এই ইলা! এত বড় লোকের মেয়ে হইয়াও তার এতটুকু অহঙ্কার নাই, ভোরের নিষ্কলুষ আলোর মত সরল সে! স্কুলে যায় নাই বটে, কিন্তু বুদ্ধি তার এত তীব্র, তীক্ষ্ণ, বাপের কাছে বসিয়াও সে এত কিছু শিখিয়াছে, যে, বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। তাহার আচরণে কোথাও এতটুকু উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, অশোভনতা নাই —অথচ নৈকট্যের, সহৃদয়তার অভাবও বোধ করা যায় না। সে জানে, ভাদ্রের ভরা নদী কূলে কূলে ভরা—আপনার ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে আপনি পরিপূর্ণ। ইচ্ছা করিলে দুকূল ভাসাইয়া, তীর-ভূমি ভাঙ্গিয়া ডুবাইয়া দিতে পারে—কিন্তু দেয় না বলিয়াই এত সুন্দর!

আনন্দ আজকাল সময় কাটাইবার একটা নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন—ব্রীজ্ খেলা। তাঁহার উপরোধে ইলাকেও যোগ দিতে হয়, তিন জনেই খেলা চলে। ইলার কোনদিন এ অভ্যাস ছিল না

ভাল সে আদৌ খেলিতে পারে না, কিন্তু না বসিলেও লোকের অভাবে খেলা হয় না। খেলিতে বসিয়া প্রতিপদে ভুল করে—ইচ্ছা করিয়া হারিয়া যায় এবং কলহাস্যে ঘরটাকে মুখর করিয়া তোলে।

খেলার মাঝখানেই খেলা ভুলিয়া কোন কোন দিন তন্দ্রাগ্রস্তের মত বসিয়া থাকে—যেন তার চোখ ও মন কতদূর দেশে চলিয়া গেছে! কখনও হঠাৎ হাতের তাশ ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় এবং বলে, ভাল লাগচে না, আমি একটু বাগানে বেড়াই।

জানালা দিয়া দেখা যায়, অন্ধকারের মধ্যে ইলা একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—কখন বা সব ভুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইলার এই অদ্ভুত আচরণের কোন সদর্থই সে খুঁজিয়া পায় না—ভারি আশ্চর্য্য লাগে!

তা লাগুক, প্রত্যহ যাওয়ার বাধা তাহাতে হয় না। সন্ধ্যা গুলি হাসি-গল্পে-গানে দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায়! অপূর্ব্ব বাসায় ফিরিয়া সমস্তক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকে, আবার কতক্ষণে সন্ধ্যা হইবে, আবার কতক্ষণে... !

সত্য কথা বলিতে কি, অপূর্ব্ব যে মাটীর উপরেই বাস করিতেছে, এ কথা তার মনে হয় না। সে যেন কোন কবির কল্প-লোকে হঠাৎ ইজারা লইয়া বাস করিতে স্নুরু করিয়াছে—

এখানে কেবল স্থর্য্যের মধুর আলো, ফুলের গন্ধ, তরুশ্রেণীর অবিরাম মর্ম্মর, আকাশের কোলে মেঘ-মায়া, অন্তর-লোকে সুধা-স্রোত!

মা ও বাবা তাহাকে ইতিমধ্যে ফিরিবার অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিয়াছেন, তা ফেরা দূরে থাকুক, পত্রের উত্তর দিবার মত ইচ্ছা বা

অবসরও বেচারী খুঁজিয়া পায় নাই। আপনার মনোলোকে যে সঙ্গীত-ধ্বনি বাজিয়াছে তাই লইয়া সে বিভোর।

সেদিন সন্ধ্যার সময় যথানিয়মে আনন্দবাবুর বাড়ী গিয়া অপূর্ব্ব শুনিল, গৃহস্বামী নাই। স্তিমিত প্রদোষান্ধকারে খোলা জানালার সম্মুখে বসিয়া—মেঘাবৃত দূর আকাশের দিকে চাহিয়া ইলা একাকিনী গাহিতেছে—

তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি,
কে তুমি দাঁড়ালে আসি নীরবে একাকী,
আজি সঘন-শর্ব্বরী, মেঘ-মগন তারা,
নদীর জলে ঝর্ঝরি, ঝরিছে জল-ধারা,
তমাল-বন মর্ম্মরি পবন চলে হাঁকি।

দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে শুনিতে অপূর্ব্বর মনে হইল, রাত্রি যেন সত্যই ঘন মেঘান্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে, নদীর জলে আকাশের জল ঝরিয়া অপূর্ব্ব ধ্বনি সৃষ্টি করিয়াছে, তমাল-তরুশ্রেণীর উপর দিয়া কোন প্রিয় নাম ধরিয়া বাতাস যেন দূর, বহু দূর-দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে !' –কণ্ঠে ভাবের কি নিবিড়তা—গান ও মন যেন এক হইয়া গিয়াছে !—এমন আবেগ-আকুতি দিয়া ইলা কোন দিন গান করে নাই।

কতক্ষণ কুহক-স্তব্ধের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া অপূর্ব্ব বলিল—ক্ষমা করবেন ইলাদেবী, বড় অসময়ে—

ইলা ভয়ানক চমকিয়া উঠিল—যেন ভূত দেখিয়াছে !

—ওঃ, আপনি ! কী ভয়ানক ভয় পেয়েছিলুম ! আসুন ! পাঞ্জাব

থেকে বাবার এক অনেক কালের বন্ধু এভারেষ্ট-হোটেলে এসে উঠেছেন।—বাবা তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

ছড়িটা টাঙ্গাইয়া রাখিয়া অপূর্ব্ব বলিল—ওঃ!—কিন্তু তাহ'লে কি করা যায় বলুন দেখি?—হঠাৎ ইলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কী আশ্চর্য্য! ভয় হচ্ছে, আপনার চোখে জল!

ইলা তাড়াতাড়ি মুখের উপর আঁচল চাপা দিয়া বলিল—কি জানি...হয়ত ভয়ানক ঘেমে উঠেছিলুম।

অপূর্ব্ব বিশ্বাস করিল না—তার নিভৃত মন যেন বসন্ত বাতাসের স্পর্শে নদীর মত দুলিয়া উঠিল, মনে হইল, যে কথা এত দিন ধরিয়া সুযোগ ও সাহসের অভাবে সে কিছুতেই বলিতে পারে নাই, আজ এই নিভৃত মুহূর্ত্তে সেটা উচ্চারণ করিয়া ফেলে।

কিন্তু তার পূর্ব্বেই ইলা বলিল—কত দিন সন্ধ্যে বেলা বেড়াতে যাই নি, চলুন 'মল' থেকে ঘুরে আসি।

অপূর্ব্ব শান্ত ছেলেটীর মত বলিল—চলুন।

মলে তরুণ-তরুণীর ভিড় লাগিয়া গিয়াছে—ছোট ছেলে-মেয়েদের কল-হাস্যে সন্ধ্যা-আকাশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

ইলা আপন মনেই পথ চলিতে লাগিল, পাশে যে আর একজন আছে সে কথা যেন তার মনেই নাই।

অপূর্ব্বও হঠাৎ যেন নির্ব্বাক হইয়া গেছে, কিছুতেই প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে পারে না। পাশ দিয়া ক্রমাগত লোক-জন যাতায়াত করিতেছে, মনের কথা কি করিয়াই বা মুখ ফুটিয়া বলা যায়। সঙ্কোচ আসিয়া প্রতি পদে অপূর্ব্বর গলা জড়াইয়া ধরিতেছে।

কিন্তু ইলারই বা মনের কথা কি? তার ব্যবহারে এত ঘনিষ্ঠতা, এত মাধুর্য্য, অথচ আজ সেও ত নিজের কথা তাহার কাছে ব্যক্ত করিতে পারিত। কিন্তু সে দিকে তার বিশেষ কোন আগ্রহই নাই। আশ্চর্য্য!

ফলে, সে দিন রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত তুইজনে পাশাপাশি ঘুরিয়া বেড়াইলেও, কোন কথাই বলা হইল না। অপূর্ব্বর ব্যাকুল কামনা নিঃশব্দেই মনের মধ্যে মরিয়া গেল।

হোটেলে ফিরিয়া অপূর্ব্ব একখানা উপন্যাসের পাতায় মন দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মন যে তখন অনেক দূরে।...না, কালই অপূর্ব্ব এই সংশয়ের, এই দ্বন্দ্বের অবসান করিবে। ইলাকে যদি নাই বলিতে পারে, তাহা হইলে আনন্দর কাছে কথাটা পাড়িবে। আনন্দবাবু যে উদার-মনা লোক, তাহাতে তিনি হয়ত অসন্তোষ প্রকাশের কোন কারণই খুঁজিয়া পাইবেন না। আর পাত্র হিসাবেই বা সে মন্দ কিসের? তার বাপেরও ত প্রকাণ্ড আয়। নিজে লেখাপড়াও সে কিছু কম শিখে নাই।

সে রাত্রে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিল—ইলা আর সে সংসার-নীড় রচনা করিয়াছে। সেবায়, সান্ত্বনায়, শ্রী ও সৌন্দর্য্যে তাহার জীবনের আকাশে যেন রামধনুর সপ্তবর্ণচ্ছটা!—প্রৌঢ় আনন্দমোহন সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

সকালে উঠিয়াও চায়ের পেয়ালার সম্মুখে বসিয়া অপূর্ব্ব সেই কথাই ভাবিতে লাগিল। কি করিয়া কথাটা সে আনন্দর সম্মুখে উচ্চারণ করিবে,—যদি গত সন্ধ্যার মত সে আবার কথা খুঁজিয়া না পায়। কিম্বা,

আনন্দ যদি বলেন, 'ভারি দুঃখিত হলাম অপূর্ব্ব, ইলার বিয়ের ঠিক এখানে আসবার আগেই হয়ে গেছে।'

—না, এত দূর কখনই সম্ভব নয়। তা হইলে সে কথা এই এক মাসের মধ্যে আভাষে ইঙ্গিতেও প্রকাশ পাইত।

যাই হ'ক, আজ সে কথা পাড়িবেই—সঙ্কল্প তার স্থির।

অপূর্ব্ব চুরুটে অগ্নি সংযোগ করিতেছিল, টেলিগ্রাফ-পিওন আসিয়া হাজির!—অপূর্ব্বর নামেই টেলিগ্রাম, সই করিয়া লইতে হইল।

টেলিগ্রাম করিয়াছেন অপূর্ব্বর বাবা—আশুতোষ রায়। যাহা বলা হইয়াছে, তাহা যেমন অস্পষ্ট, তেমনি দুর্ব্বোধ্য।

"...সকলেই উদ্বিগ্ন,—প্রাপ্তি মাত্র চলিয়া আসিবে, একান্তই প্রয়োজন, এই সঙ্গে টাকাও পাঠাইলাম।..."

অপূর্ব্ব কিছুতেই ঠিক করিতে পারিল না, ইতিমধ্যে সকলের হঠাৎ উদ্বিগ্ন হইবার কি কারণ ঘটিল।

একান্ত প্রয়োজন বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু সেটা কি তাহা কিছুই জানান হয় নাই। কাহারও অসুখ করিল?—কার? কিছুই বলা হয় নাই, অথচ পাছে টাকার অভাবে দেরী হয়, সে জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকাও পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

অনেক ভাবিয়া অপূর্ব্ব স্থির করিল, সম্ভবতঃ কাহারও কিছুই হয় নাই। অনেক দিন বাড়ী-ছাড়া, চিঠিপত্রও দেয় নাই বহুদিন, সেই জন্যই বা হয়ত সকলে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন।

হইবার কথাও বটে, ফিরিয়া যাওয়াও তাহার উচিত। দশ পনের দিনের জন্য সে বেড়াইতে আসিয়াছিল—কিন্তু কাটিয়া গেল এক মাসের

উপর। যতীশ ফিরিয়া গেল, কিন্তু তার সে বিষয়ে কোন আগ্রহই নাই।

—না, যাওয়া উচিত বটে! কিন্তু, যে কথাটী উত্থাপনের জন্য কাল হইতে সে ব্যাকুল, এই একটু আগে যে কথা সে ভাবিতেছিল—সে বিষয়ে কি করা যায়। কথাটা পাড়িয়া সহসা বাড়ী ফিরিয়া যাওয়াই কি খুব ভাল দেখাইবে?

অপূর্ব্বর কান্না পাইতে লাগিল। বাবার যেন এতটুকু বুদ্ধি নাই—হঠাৎ 'তার' করিয়া বসিলেন। ছেলের তাঁহার বয়স হইয়াছে, দার্জ্জিলিঙ্ সহরও খুব প্রকাণ্ড নয় যে অপূর্ব্ব হারাইয়া যাইবে।

সন্ধ্যার সময় গাড়ী।

ঘণ্টা কয়েক কণ্টক-শয্যায় কাটাইয়া দিয়া, তিনটার সময় অপূর্ব্ব ইলাদের বাড়ী গিয়া হাজির!

সবাই তখন ঘুমাইতেছে। অপূর্ব্ব সংবাদ দিল। আনন্দ উঠিয়া আসিয়া কহিলেন,—কি ব্যাপার অপূর্ব্ব, এমন অসময়ে— ?

—তাই বটে। আজই আমায় কলকাতায় ফিরতে হচ্চে।

—সে কী রকম হ'বে! কই কালও ত ইলাকে তুমি কিছু বলে যাওনি!

—আজ্ঞে না, এইমাত্র বাবার টেলিগ্রাম পেলুম।

টেলিগ্রাম দেখিয়া আনন্দ বলিলেন—তা হ'লে ত যাওয়াই উচিত; নিশ্চয়ই বিশেষ কোন দরকার পড়েচে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

অপূর্ব্ব ভাবিল, কথাটা এইবার বলিয়া ফেলে, কিন্তু আনন্দ হঠাৎ ভিতরে চলিয়া গেলেন ইলাকে ডাকিতে। অনেক চেষ্টা করিয়া অপূর্ব্ব

যে সাহস সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা মাঝ পথেই নষ্ট হইয়া গেল! অপূর্ব্ব অনেক দুঃখে মনকে প্রবোধ দিল, থাক্ বাড়ীতে মায়ের কাছে সব কথা জানাইয়া, চিঠিতে সে ইঁহাদের জানাইবে। এই কাজটাই তাহার নিকট খুব সহজ ঠেকিল, অনেক লজ্জার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে।...

ইলা বলিল—ভারি আশ্চর্য্য হ'লাম—আপনার যাবার খপর পেয়ে।

অপূর্ব্ব ভাবিল, শুধুই আশ্চর্য্য!—দুঃখিত নয়!

আনন্দ বলিলেন—তা হ'লে ত' ট্রেণের আর খুব বেশী দেরী নেই, তুমি তৈরী হয়ে নাওগে অপূর্ব্ব, আমি আর ইলা ষ্টেশনে গিয়ে ওয়েট্ করব।...সন্ধ্যে বেলাটা এখন থেকে আবার পথে পথেই কাটাতে হ'বে, বোঝা যাচ্চে।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, অপূর্ব্ব আনন্দ ও ইলাকে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল। আরও কত লোক—ইংরাজ, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, ছোট ছেলে-মেয়ে সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, পোর্টার-দল কলরব করিতেছে।

কত লোক আসিয়াছে—বিদায় দিতে, কত লোক আসিয়াছে—অভ্যর্থনা করিতে। কিন্তু অপূর্ব্বর মন তখন আর এক জগতে হারাইয়া গিয়াছে। আবার কতদিন পরে একখানি প্রিয়-পরিচিত মুখ তাহার চোখে পড়িবে—তা' কে বলিতে পারে?

ইলা বলিল—আশা করি, অপূর্ব্ববাবু বাড়ী ফিরে, এই জঙ্গলের অধিবাসীদের পৌঁছানর সংবাদ দিয়ে ধন্য করবেন।...আপনার পণ্ডিত-বন্ধুটী ত' সেটাও আবশ্যক মনে করেন নি!

অপূর্ব্ব বলিল—নিশ্চয় চিঠি দেব—গিয়েই।...আপনি জানেন না ইলা দেবী—

ইলা বলিল—আমি জানি অপূর্ব্ববাবু, আপনি যতীশ ন'ন!

অপূর্ব্ব উল্লসিত হইয়া উঠিল!...পার্শ্ববর্ত্তিনীর মনের খপর রাখিলে আর এক রকম হইত।

টিকিটের ঘণ্টা পড়িল—গাড়ীও আসিয়া পড়িল। তবু, বিদায়ের মুহূর্ত্ত যে আসন্ন হইয়াছে, এ কথা যেন অপূর্ব্ব কল্পনাই করিতে পারে নাই। সমস্তটাই যেন স্বপ্ন মধুর,—তিক্ত স্বপ্ন। দার্জ্জিলিঙের পাহাড়ে, কুয়াসায়, রৌদ্রবৃষ্টিতে স্বপ্ন, তার আসা স্বপ্ন, যাওয়াটাও প্রকাণ্ড স্বপ্ন!

পোর্টার বেডিং ও সুটকেশটা ট্রেণে তুলিয়া দিল; বাঁশী বাজিল, পতাকা ত্বলিল—

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে—

আনন্দ বলিলেন—হোপ টু মিট্ ইউ 'গেন্!...এবার এলেই আমার বাংলোয় উঠ্‌বে।

জানালা দিয়া তুই জনেই তার কর-পীড়ন করিল।

...কলিকাতায় ফিরিয়া অপূর্ব্ব দেখে—বাড়ীর সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে—আগাগোড়া চূণকাম হইতেছে। ভাবিয়াছিল নিশ্চয়ই একটা অঘটন ঘটিয়াছে, কিন্তু সে সবের বিশেষ কোন লক্ষণই দেখা গেল না; দিব্য স্বস্থ চিত্তে বাহাল তবিয়তে সবাই ঘোরা-ফেরা করিতেছে, বরং সবারই মুখে যেন একটা চাপা হাসি।

মায়ের কাছে গিয়া অপূর্ব্ব বলিল—এর মানেটা কি শুন্‌তে পাই? আমি ত ভাবলাম, হয় বাড়ীতে ডাকাতী হয়ে গেছে, নয়ত কেউবা পটলই তুল্‌ল।

মা বলিলেন—ছি, ওকথা কি বলতে আছে?

—তা নেই, কিন্তু এই তাড়ার মানেটা কি?

—সুস্থির হও; সব কথাই উনি বলবেন।

—উনি নাই বললেন, তোমার কাছে শুন্‌তে পাই না?

—তা পার বৈ কি বাবা, লুকো-ছাপার কথা ত আর নয়, সব কথাই শুন্‌তে পাবে। নেয়ে খেয়ে জিরোও আগে।

অপূর্ব্ব দেখিল—আশা নাই। হতাশ হইয়া নিজের ঘরে গিয়া খিল দিল এবং ইলাকে চিঠি লিখিবার জন্য কাগজ পত্র বাহির করিয়া বসিল।

হঠাৎ ছোট বোন্ অলকা আসিয়া দুয়ার ঠেলা-ঠেলি সুরু করিয়া দিল।

—দাদা, শীগ্‌গীর দোর খোল।

দুয়ার খুলিয়া অপূর্ব্ব বলিল—কী হয়েচে কি? এত চীৎকার করছিস কেন?

অলকার বয়স আট-নয়ের বেশী নয়। রেশমের গুচ্ছের মত ঝাঁকড়া চুলগুলি দুলাইয়া বলিল—আমার দার্জ্জিলিঙের মালা কই?

অপূর্ব্ব যাইবার সময় ছোট বোন্‌কে এই জিনিসটী আনিয়া দিবার লোভ দেখাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া এ কথা মনে করিবার অবসর হয় নাই।

অপূর্ব্ব বলিল—নেই, পালা—বিরক্ত করিস নে!

অলকা ত চটিয়া অস্থির! গাল ফুলাইয়া কাঁদিবার উপক্রম করিল। বিব্রত অপূর্ব্ব তাড়াতাড়ি পার্ল-খচিত পার্কার-পেনটা তার হাতে দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিল। হঠাৎ তাহার মনে হইয়াছে, অলকার মারফতে কোন কথা জানা যায় কি না! কোলে তুলিয়া বলিল—এইবার গেলেই এনে দেব—চুপ কর। একটা কথা বল্ দেখি, হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠালে কেন?

অলকা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—সে কী! তোমার যে বিয়ে হ'বে—আমরা যে মেয়ে দেখে এলুম মায়ের সঙ্গে! তুমি বুঝি কিছুই জান না?—ও হরি—কি মজা!

অলকা হাত তালি দিয়া হাসিতে সুরু করিয়া দিল।—দাদার বিয়ের কথা দাদাই জানে না! কী মজা!

কিন্তু অপূর্ব্বর মনের অবস্থা তখন ঠিক হাসিবার মত বা হাসি

শুনিবার মত নয়। ধমক্ দিয়া বলিল—চেঁচাতে হবে না তোকে, এখান থেকে পালা।

দাদার এই আকস্মিক মেজাজ পরিবর্ত্তনের কারণ অলকা বুঝিল না, খানিক বোকার মত দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল।

—অপূর্ব্বর চোখের সামনে আকাশ ও ধরিত্রী সহসা যেন অন্ধকারে ডুবিয়া গেছে!......না, না, এ কথা কখনই সত্য হইতে পারে না—অলকা কি শুনিতে কি শুনিয়াছে।

অপূর্ব্ব মায়ের কাছে ছুটিল।

—কী শুনচি মা!—সে কী সত্যি?

মা বুঝিলেন—সংবাদ প্রচার হইয়া গিয়াছে। বলিলেন—সত্যি বই কি বাবা!

অপূর্ব্ব বলিল—বিয়ে আমি করব না।

—সে আবার কি কথা! পুরুষ মানুষ আবার বিয়ে করে না কে?

—বিয়ে করতে আমি অমত করি নি, কিন্তু ওখানে নয়।

—কোথায়—কেমন মেয়ে কিছু না শুনেই?

—হ্যাঁ, সে মেয়ে তোমার অপ্সরা-তিলোত্তমা হলেও না। যদি সে চেষ্টা কর, তা'হলে আমি আজই আবার টিকিট কাটব!

—সে আবার কি অলুক্ষণে কথা! কর্ত্তা যে সেখানে কথা দিয়ে এসেচেন, পরশু দিন পাকা দেখার দিন ঠিক হয়েচে।

—কথা দেবার আগে একবার আমার মত নেওয়াও কি দরকার ছিল না? বিয়ে বোধ হয় আমাকেই করতে হ'বে?

—নইলে আবার কে আছে যে...... কি যে বলিস বাবা, কিছুই

বুঝি না। না বাবা, মন স্থির কর, অমত করলে উনি ভারি কষ্ট পাবেন। আর সে মেয়ে পরমা সুন্দরী—একেবারে—

—রাজকন্যে ; তা অনেক আগেই বুঝেছি। কিন্তু তার জন্যে রাজপুত্তুরই ভাল। আমি যা আছি, তাই থেকে যাই।

হৈমবতী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কাল কন্যাপক্ষ আসিবে—ছেলে দেখিতে, পরশু আশীর্ব্বাদ !

খাওয়া দাওয়ার পরে, কর্ত্তার ঘরে অপূর্ব্বর ডাক পড়িল। আশুতোষ তাকিয়া হেলান দিয়া সুগন্ধি কস্তুরী তামাকের সৎকারে নিযুক্ত ছিলেন। অপূর্ব্ব ভাবিয়াছিল, নিশ্চয়ই সে তাঁহাকে ভয়ানক উগ্র মূর্ত্তিতে দেখিবে। কিন্তু তাঁহার মধ্যে কোন চাঞ্চল্যই দেখা গেল না। ঘরের কোণের চেয়ারটা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—বোসো।

ভাবিয়াছিল, বাবা খুব খানিকটা উষ্মা প্রকাশ করিবেন এবং সেও তাহার যথোচিত উত্তর দিবে। কিন্তু সে সবের লক্ষণই দেখা গেল না।

আশুবাবু বলিলেন—হঠাৎ টেলিগ্রাফ পেয়ে ভারি আশ্চর্য্য হয়েছিলে বোধ হয় ?—হবারই কথা। দিন দশ পনের পূর্ব্বে আমার হঠাৎ এক পুরাণ বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বহুকাল দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। বললেন, মেয়ের বিয়ে না দিতে পেরে বড়ই ব্যস্ত আছেন। অথচ মেয়েটী শিক্ষিতা এবং সুন্দরী। দেখে এসে ভারি ভাল লাগ্‌লো—তোমার মাও গিয়েছিলেন। আমি তাঁদের কথা দিয়েছি।

এমন ভাবে ধীরে ধীরে তিনি সবটা বলিয়া গেলেন, যেন অপূর্ব্বর আপত্তির কথা এখনও জানেনেই না। অথচ হৈমবতী সেকথা তাঁহাকে অনেক আগেই বলিয়াছেন।

অপূর্ব্ব প্রমাদ গণিল; কড়া কথার উপর কড়া কথা বলা যায়, কিন্তু এই অবস্থায়......

আশুবাবুও পরম নিরুদ্বিগ্ন মনে ধূম্র উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন।

অপূর্ব্বর কাণ-মাথা গরম হইয়া গেল। কি করিয়া মনের কথাটা প্রকাশ করা যায়!

অনেকক্ষণ পরে আশুবাবু বলিলেন—বিশ্রাম করগে যাও। পরশু তাঁরা আশীর্ব্বাদ করতে আসবেন—বাড়ী থেক'।

অপূর্ব্ব আর পারিল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি বিয়ে করতে পারব না, আমায় মাপ করবেন।

—কেন পারবে না? এটা খুব শ্রমসাধ্য কাজ নয়।

অপূর্ব্ব বলিল—আপনার সঙ্গে এ' নিয়ে তর্ক করা আমার উচিত নয়। আমার পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়—এইটুকুই আপনাকে জানালাম।

অপূর্ব্ব দ্রুত ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।...

শয্যায় পড়িয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে স্থরু করে। কি কুক্ষণেই তারা কলিকাতা ছাড়িয়াছিল। একবার যতীশের কাছে যাইবে? সে যদি কোন সৎ পরামর্শ দিতে পারে? না, এ সম্বন্ধে সে কি-ই বা করিতে পারে।

ঘুম হইতে উঠিয়া অপূর্ব্ব দেখিল—সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। গ্যারেজ্ হইতে মোটর বাহির করিয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইল। পথের আলোক-সমারোহ, জল-যানের বাহুল্য—নগর-পথিকদের কলরব—সব তার কাছে বিস্বাদ! চৌরঙ্গীর কাছে একটা বুড়া সাহেবকেই আর একটু হইলে সে চাপা দিতেছিল। লোকটা

রাগিয়া ঠক-ঠক করিয়া অনেক ভাল-মন্দ কথা শুনাইয়া দিল,—অন্য সময়ে অপূর্ব্ব তাহার নাকে হয়ত একটা ঘুঁসি বসাইয়া দিত—আজ নিঃশব্দে চলিয়া আসিল।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর, অপূর্ব্ব ইলাকে আবার চিঠি লিখিতে বসিল। কিন্তু একটা ঘণ্টা কাটিয়া গেলেও, একটা কথাও সে লিখিতে পারিল না, বার চারেক 'মিস্ রায়' ও 'ইলা দেবী' লিখিয়া ও কাটিয়া, অবসন্ন চিত্তে শুইয়া পড়িল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার জীবনে যেন প্রকাণ্ড একটা ভূমিকম্প হইয়া গেছে!

অপূর্ব্ব শুইবার ঘণ্টা খানেক পরে, হৈমবতী ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, টেবিলের উপর কতকগুলি চিঠির কাগজ—তাহাতে গণ্ডা কয়েক 'মিস রায়' ও 'ইলাদেবী' লেখা। এগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিবার কথা অপূর্ব্বর মনেই ছিল না।

...কে ইলাদেবী, হৈম কিছুই বুঝিলেন না।

অপূর্ব্ব ঘুমাইতেছে—সেই নিদ্রা-শ্রান্ত মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনে হইল, এই ইলার জন্যই যদি সে বিবাহে আপত্তি করিয়া থাকে!

হৈম ধীরে ধীরে ছেলের পাশে গিয়া বসিলেন।

—অপূর্ব্ব, জেগে আছিস বাবা?

বার দুই ডাকিবার পর অপূর্ব্ব চোখ মেলিল।

—তোমরা কি ঘুমুতেও দেবে না নাকি? এতরাত্রে—

ছেলের মাথার চুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে হৈম বলিলেন—কথা আছে বাবা, নইলে কি শুধু শুধু রাত্রে বিরক্ত

করি ? দোহাই বাবা, রাগ করিসনে, একটা কথা জান্‌তে চাই, সত্যি বলিস্‌।

—না, তোমার কাছে খালি মিথ্যাই বলি। যাক্‌, ভূমিকা ছেড়ে আসল কথা বল।

চিঠির কাগজ খানা দেখাইয়া হৈম বলিলেন—তোর এই ইলা দেবী কে রে— ?

অপূর্ব্ব ক্ষণকাল নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর বলিল—জানি না।

মা হাসিলেন—না জেনেই চিঠি লিখ্‌ছিলি ? কে শুনিই না বাবা, মায়ের কাছে লজ্জা করতে নেই।

অপূর্ব্ব বলিল—একটী মেয়ে।

—ইলা যে পুরুষের নাম নয়, এ' বোঝবার বয়েস আমার হয়েচে রে। এর নাম ত' কোন দিন আগে শুনিনি, তাই জিজ্ঞেস করছি, কোথায় থাকে—কি করে ? তোদের সঙ্গে পড়ত বুঝি— ?

—না। দার্জ্জিলিঙে আলাপ হয়েছে।

মা মনে মনে হাসিলেন। হয়ত তাঁহার সন্দেহ মিথ্যা নয় বলিলেন—এই জন্যেই বুঝি বিয়েতে যত আপত্তি ?...তা' মাকে বুঝি সে কথা বলতে নেই ?

মায়ের স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বরে, রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে অপূর্ব্বর চক্ষে জল আসিল। কোন কথাই সে লুকাইতে পারিল না।

পুত্রের শয্যায় হাত দিয়া হৈম বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। ছেলের স্বীকারোক্তির পরে তাহার কামনাটাকে নিস্ফল করিয়া দিবার

ইচ্ছা তাঁহার ছিল না—কিন্তু কর্ত্তার সম্মুখে কথা বলিবার সাহসও তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না।

অপূর্ব্ব বলিল—কি বলছ ?

হৈম বলিলেন—আজ রাত্রে ঘুমোও। কাল এর যা হয় ব্যবস্থা করব।

অপূর্ব্ব ঘুমাইবার চেষ্টা করিল—কিন্তু কোথায় ঘুম ? শঙ্কিত চিত্তে সে প্রভাতের জন্য প্রহর গণিতে লাগিল। বাহিরের আকাশে প্রকাণ্ড চাঁদ, জ্যোৎস্না যেন সমস্ত পৃথিবীর উপরে স্নেহ-বৃষ্টি করিতেছে। অপূর্ব্বর বুকে অন্ধকার !

পরদিন বেলা নয়টায় আশুবাবুর ঘরে অপূর্ব্বর ডাক পড়িল। বলিলেন—সব কথা শুনলুম, কিন্তু সত্যিই কি সেখানে বিবাহ করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয় ?

লজ্জায় অপূর্ব্বর মাথা ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল, বলিল—না।

—ভারি দুঃখিত হলুম। কিন্তু তোমার যখন মত নেই—তখন তা নিয়ে টানাটানি করে লাভ নেই।

অপূর্ব্ব মনে মনে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া জননী ও পিতাকে ধন্যবাদ দিল।—আনন্দে হঠাৎ বুঝি কাঁদিয়াই ফেলে।

কিন্তু তারপরেই আবার আসিল একখণ্ড ঘন, গাঢ় কালীবর্ণ মেঘ। সে মেঘ আর কাটিল না।

আশুবাবু বলিলেন—এই বাড়ীঘর, সম্পত্তি, আমার অবর্ত্তমানে সমস্তই তোমার। সেইজন্যেই আমি চাই না, যে, এই কটা দিনের জন্যে তোমায় কষ্ট দিয়ে যাব।...কিন্তু কাল তোমার মায়ের কাছে যে



কতক্ষণ কুহক-স্তব্ধের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া অপূর্ব্ব বলিল—ক্ষমা করবেন ইলা দেবী, বড় অসময়ে—

পৃষ্ঠা ১৩০ ।

মেয়েটীর কথা বলেছ, তাঁর কথা আমি কিছুই জানি না। সেটা আমার জানা দরকার।

অপূর্ব্ব ইলার পিতার নাম করিতেই আশুবাবু বলিলেন—আনন্দ চৌধুরী......নামটা পরিচিত বলে মনে হচ্চে! কোথায় দেশ বল দেখি?

অপূর্ব্ব বলিল—ঢাকা তাঁদের দেশ, কিন্তু কলকাতাতেই বহুদিন ধরে আছেন। বালীগঞ্জে তাঁদের বাড়ীও আছে।

আশুবাবু যেন নিজের মনে মনেই বারকয়েক বলিলেন—বালীগঞ্জে বাড়ী—আনন্দ চৌধুরী......আহা কিছুতেই ঠিক মনে করতে পারছি না—ঠিক এই নামেরই একটা ছেলের সঙ্গে আমরা যেন পড়েছিলুম!

খানিক ভাবিয়া লইয়া আশুবাবু বলিলেন—হয়েচে, হয়েচে! আমাদের সঙ্গেই পড়ত বটে! আচ্ছা, তিনি কি বিলেতে আই, সি, এস, পড়তে গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছিলেন—?

অপূর্ব্বর মন আনন্দে লাফাইয়া উঠিল; তবে আনন্দও তার বাবার পরিচিত—ইলা তাঁহার বন্ধু-কন্যা! তবে ত' বাধার কোন কথাই উঠিতে পারে না! উৎফুল্ল কণ্ঠে অপূর্ব্ব জানাইল—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

কিন্তু উত্তর শুনিয়া আশুবাবুর মুখে বিশেষ আনন্দের আভা দেখা গেল না—সেখানে একটা ঘন কাল চিন্তার ছায়া পড়িয়াছে।

অপূর্ব্ব কিছু বুঝিল না—নির্ণিমেষ নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। গড়গড়ার নল হইতে খুব খানিকটা ধূম উদ্গীরণ করিয়া আশুবাবু বলিলেন—এখানে তোমার বিয়ে হওয়া অসম্ভব!

অপূর্ব্বকে কে যেন অনেক উঁচু হইতে একটা অন্ধকার গহ্বরে ফেলিয়া দিল! সহসা কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না!...ঘরখানা যেন চোখের সামনে দুলিতেছে...

অনেকক্ষণ পরে শুষ্ককণ্ঠে বলিল—কেন?

আশুবাবু মুখ না তুলিয়াই বলিলেন—আনন্দ চৌধুরী ব্রাহ্ম; ব্রাহ্মর মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়।

আনন্দ চৌধুরী ব্রাহ্ম! কী আশ্চর্য্য! এ কথাটা সে এতকাল সেখানে থাকিয়াও জানিতে পারে নাই! কিন্তু হইলেই বা ব্রাহ্ম, তারা মানুষ নয়? তারা শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে বিদ্যায়—কিসে তাহাদের চেয়ে কম? ধর্ম্মের বড়াই করিয়া হৃদয়কে উপবাসী করিবার পাত্র অপূর্ব্ব নয়!

স্থির স্বরে বলিল—ব্রাহ্ম-পরিবারের মেয়ে বিয়ে করাকে আমি খুব বড় একটা পাপ মনে করি নে।

আশুবাবু তেমনি স্থির কণ্ঠে জবাব দিলেন—তুমি কর না কিন্তু আমি করি। এতগুলো দিন যে ধর্ম্মের আশ্রয়ে কাটিয়ে এলাম, তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তোমার বক্তৃতা শুনতে চাই না। এ সম্বন্ধে বেশী কথা ক'য়ে কিছু ফল হবে না। অপূর্ব্ব! তুমি ভিতরে যাও। বন্ধুকে যা কথা দিয়েছি, তা আমি লঙ্ঘন করতে পারি, কিন্তু আমার ছেলেকে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করবার অনুমতি দিতে পারি না।

অপূর্ব্ব আরও কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিল—আশুবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—আমার বিশ্বাসের ওপর আঘাত করবার চেষ্টা

তুমি ক'র না অপূর্ব্ব। ফল হবে না, তোমার সঙ্গে মতান্তর হ'তে পারে, কিন্তু মনান্তর হওয়াটা আমার অভিপ্রায় নয়।

সে কঠিন মুখের দিকে চাহিয়া অপূর্ব্ব আর দ্বিরুক্তি করিল না; নিজের ঘরে গিয়া খিল দিল।

৮

দার্জ্জিলিঙের জন-হীন পথে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ইলার মুখের দিকে চাহিয়াই যতীশের মনে হইয়াছিল, আশ্চর্য্য! এতরূপও একটী দেহাধারে থাকিতে পারে! সেই সঙ্গে নিজের অবস্থার কথা তুলনা করিয়া যতীশ বিলক্ষণ ভয় পাইয়াছিল। ধনী-কন্যা ইলার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার সাহস তাহার হয় নাই। তাই অকস্মাৎ সে বন্ধুর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল—কলিকাতায়।

ভাবিয়াছিল, থিসিস্ রচনার জন্য নিজেকে চিন্তার সাগরে ডুবাইয়া দিবে, দার্জ্জিলিঙের মায়াপথে কোন দিন কোন অদ্ভুত রূপসীর সহিত তাহার ক্ষণকালের জন্য পরিচয় হইয়াছিল—এ কথা সে মনেই রাখিবে না। জোনাকী হইয়া চাঁদ ধরিবার সাধে তাহার কাজ কি!

কিন্তু বহু আয়োজন, বহু সাবধানতা সত্ত্বেও সেই অপূর্ব্ব সুন্দর মুখখানি, হাস্যময় নিষ্কলুষ চক্ষু দুটী ভোলা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না! রজনীর অটুট স্তব্ধতার মধ্যে নির্জ্জন ঘরে বসিয়া যত রাজ্যের বই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ইলাকে তাহার মনে পড়িত, মনে পড়িত—ইলার কোমল কণ্ঠ, অকারণ কলহাস্য! গভীর রাত্রে অধ্যয়ন-ক্লান্ত মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিবার জন্য যতীশ যখন শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিত, তখন মনে হইত দুটী স্নিগ্ধ শীতল শুভ্র করতল বুঝি তার তন্দ্রা-নিমীলিত চোখের উপর স্নেহ স্পর্শ বুলাইয়া দিতেছে! কিন্তু সে একটা মায়া! যতীশের একটা অসম্ভব দুরাকাঙ্ক্ষা!—যতীশ এই কথাই ভাবিত।

সে দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিবার পরই, রাধাবল্লভ হঠাৎ পড়িয়া গেলেন অসুখে। ডাক্তারের বাড়ী ছুটাছুটি, ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা—সর্ব্বোপরি থিসিসের চিন্তা—যতীশের আর বিশ্রামের অবকাশই রহিল না। অপূর্ব্বকে চিঠি লিখিবার কথা প্রত্যহ মনে হইলেও—লিখিয়া উঠা কোন দিনই হইত না।

অপূর্ব্ব ফিরিল কি সেইখানেই রহিল, সে সংবাদটা পর্য্যন্ত যতীশ জানিত না। তাই সেদিন রুক্ষবেশ ও শুষ্ক মুখ লইয়া অপূর্ব্ব যখন তার পড়ার ঘরে আসিয়া ঢুকিল, তখন সে আশ্চর্য্য না হইয়া পারে না।

বলিল—এ কি মূর্ত্তি! কোত্থেকে? কবে এলে?

অপূর্ব্ব চেয়ারে বসিয়া বলিল—অতগুলো প্রশ্নের জবাব একসঙ্গে দিতে পারবো না, বিস্তর ছুটো-ছুটি করে আসচি। একটু জল খাওয়াও।

জলের গ্লাসটা এক নিশ্বাসে নিঃশেষ করিয়া অপূর্ব্ব বলিল—তোমার খবর কি তাই বল—আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি, যে, এই একমাসের মধ্যে তুমি একখানা চিঠিও লিখতে পারলে না?

যতীশ বলিল—বিলিভ্ মি—এই ক'দিন বাবার অসুখের জন্যে এতটুকু সময় করে উঠতে পারি নি, নইলে আমি এত স্বার্থপর নই যে—

অপূর্ব্ব বলিল—দ্যাট্‌স্ অল্। আমি এ কথা জানতাম না।

যতীশ বলিল—তোমার খবর কি বল, কবে এলে?

অপূর্ব্ব বলিল—দিন দুই। কেন, কি অবস্থায় আসিতে হইল কিছুই বলিল না। একটা চুরুট ধরাইয়া বলিল—এই ক'দিন ভারি

ব্যস্ত ছিলাম, তাই দেখা করতে পারি নি। আজও এই মাত্র প্যাসেজ্ বুক করে আসচি।

—প্যাসেজ্ বুক করে আসচ—তার মানে?

—বিলেত যাচ্চি, কৃষি-বিদ্যে শিখতে—! এখানে আর ভাল লাগল না।

—তোমার আবার কৃষি-বিদ্যা শিখবার হঠাৎ কি দরকার হ'ল? কই এ' কথা ত' আগে কিছুই শুনিনি!

একচোট্ হাসিয়া লইয়া অপূর্ব্ব বলিল—আগে কি ছাই আমিই জানতাম? হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, এখানে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব, তাই চলেচি। আবার যেদিন দেখব, সেখানে ভাল লাগচে না, তখন আবার ফিরব। তবে ফেরবার চান্স্ খুব কম।

যতীশ হাসিয়া ফেলিল—কি যা' তা' বক্‌চ! একটু সিরিয়াস্ হ'বার চেষ্টা কর না!

—এর চেয়ে সিরিয়াস্ হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্বাস না কর উপায় নেই। হাতে আর কিছু টাকা থাকলে তোমাকেও কালাপাণি পার করিয়ে আনতুম।

যতীশ বলিল—থ্যাঙ্ক্ গড, সে শীতের রাজ্যে যাবার বাসনা আমার কোন কালেই নেই। দার্জ্জিলিঙেই কিছু নমুনা পেয়ে এসেছি কি না!

আবার দার্জ্জিলিং!

অপূর্ব্ব বলিল—ব'সো। অনেকগুলো জিনিস পত্র এখনো কিন্‌তে বাকী। কাল আবার আসব'খন।

—কিন্তু যাত্রার তারিখ কবে ?

—পরশু ; আশা করি—Send off দিতে যাবার ফুরসৎ করে উঠতে পারবে।

যতীশ বলিল—নিশ্চয়ই।

অপূর্ব্ব চলিয়া গেল। কিসের জন্য সে আজ উল্কার মত সাগর-নদী ডিঙ্গাইতে ব্যাকুল, সে কথা যতীশ জানিল না। দুইটী বাল্য-বন্ধুর মধ্যে অদৃশ্য একটা যবনিকা রহিয়া গেল।

বিদায়ের দিন যতীশ ঘাটে উপস্থিত হইল। কত রকমের বেশ ও বিলাসের পরিচয়, কত রকমের নিয়ম-কানুন !

সিঁড়িতে উঠিবার পূর্ব্বে অপূর্ব্ব বলিল—জাহাজ যদি মাঝপথে ডুবে না যায়, তা' হলে লণ্ডনে পৌঁছে চিঠি দেব। কিন্তু প্রার্থনা করি; পথে এমনি ঝড়ই উঠুক—যাতে জাহাজ একেবারে তলিয়ে যায়।

যতীশ তাহার কাঁধে একটা চাপড় দিয়া বলিল—এই বুঝি বিদায় সম্ভাষণ ? রাস্কেল্ !

অপূর্ব্ব শুধু হাসিল।

জাহাজ ছাড়িবার সময় হইয়াছে। জেঠিতে অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষের ভিড়, পুলিশ ও পোর্ট কমিশনারের কর্ম্মচারীদের সমারোহ ! উপরের যাত্রীরা নীচে দণ্ডায়মান প্রিয়জনের দিকে চাহিয়া রুমাল বা টুপী নাড়িতেছে, তাহারাও ঠিক তেমনি করিয়াই দিতেছে তার উত্তর !

অপূর্ব্ব যতীশের কর মর্দ্দন করিয়া বলিল—যদি কোন দিন ফিরি, তা' হলে আশা করি শুভদিনে তুমি সস্ত্রীক আমার অভ্যর্থনার জন্যে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে।

যতীশ বলিল—Let us hope so, ভাল জিনিসের স্বপ্নটাও ভাল!

আর একবার কর-পীড়ন করিয়া অপূর্ব্ব উপরে উঠিয়া গেল।

কয়েক মিনিট পরে জাহাজ গেল ছাড়িয়া, যতক্ষণ দেখা গেল, অপূর্ব্ব তার বন্ধুর দিকেই চাহিয়া রহিল—যতীশও চাহিয়া রহিল—অপস্রিয়মান সেই জল-যানের দিকে! কেহই জানিল না যে, জীবনের বিশেষ একটী ক্ষেত্রে তাহারা আজ আর বন্ধু নয়—প্রতিযোগী।

কাহারও মনের কথা কেহ জানিল না।

জাহাজের বিরামহীন গতির সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত কলিকাতা ক্রমশঃই পিছাইয়া যাইতে লাগিল। পথঘাট, প্রকাণ্ড অট্টালিকাশ্রেণী গেল অস্পষ্ট হইয়া। গঙ্গার মুখ প্রশস্ত হইতে হইতে একেবারে হঠাৎ এক সময়ে অতিশয় বিস্তৃত হইয়া গেল; এপারে-ওপারে কিছুই দেখা যায় না! উপরের অখণ্ড আকাশের মত জলও যেন সীমাহীন!

অপূর্ব্ব বুঝিল—কলিকাতার সহিত তাহার বিচ্ছেদ হইয়া গেল। বন্ধু, পিতা-মাতা—সকলের সহিত! কিন্তু কেমন করিয়া কোথা দিয়া যে এত বড় ঘটনা একটা ঘটিয়া গেল, সহসা অপূর্ব্ব ঠিক করিতে পারিল না।

পিতার স্থির আশক্তির কথা শুনিয়াই সে এই পথে তরী ভাসাইয়াছে এ কথা ঠিক, কিন্তু এক সপ্তাহের পূর্ব্বেও সে ভাবে নাই, যে, এতশীঘ্র তাহাকে এতকালের পরিচিত কলিকাতা ছাড়িতে হইবে। মায়ের স্নেহময় শান্ত মুখচ্ছবি, পিতার গভীর মৌন বিষন্ন দৃষ্টি, আসিবার সময় অলকার ক্রন্দন সমস্তই অপূর্ব্বর মনের দুয়ারে চীৎকার করিয়া

বলিতে লাগিল—ফিরিয়া যাও অপূর্ব্ব, ফিরিয়া যাও! তাহাদের বুকে কত বড় ব্যথা হানিয়া আসিয়াছ, সে কথা তুমি জানো না।

অপূর্ব্বর চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। জানে, সবই সে জানে! কিন্তু সেখানে তার স্থান নাই। সেখানকার বাতাসে দুঃসহ ক্লান্তি, অপার বিষণ্ণতা! তার স্থান বিরাট জন-কোলাহলের মাঝে; যেখানে জীবন-স্রোত উচ্ছল, উদ্দাম,—আত্ম-বিস্মৃতি সুলভ!

৯

অপূর্ব্বর বিলাত-যাত্রার পর একটী মাস কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে সে যতীশকে একবার মাত্র পত্র লিখিয়াছিল মার্সেলিস্ হইতে। লিখিয়াছিল—উন্মত্ত সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত রূপ দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেছে, কয়েকদিন পূর্ব্বে তার সমুদ্র-পীড়া হইয়াছিল—এখন একটু সুস্থ আছে।

তারপর এই কয়দিনের মধ্যে তার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।...অদ্ভুত ছেলে অপূর্ব্ব!

কেন যে এমনি হঠাৎ সে চলিয়া গেল, যতীশের কাছে সে কথা একেবারে অস্পষ্ট রহস্যময়!

থিসিস্ লেখা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, একবার সেটাকে রিভাইজ্ করিয়া লইতে পারিলেই যতীশ নিশ্চিন্ত! তারপর নামের সঙ্গে অর্থ, সংসারের দুর্ভাবনা হইতে মুক্তি, লক্ষ্মীর বিবাহ...ব্যস!...

বৃদ্ধ রাধাবল্লভও জীর্ণ শরীর মন লইয়া পুত্রের সেই সৌভাগ্যের দিনই গণিতেছিলেন। শেষ নিঃশ্বাস ফেলিবার আগে ছেলে-মেয়ে-গুলিকে সুখী দেখিয়া যাইতে পারিলে তিনি আর কিছুই চাহেন না।

যতীশ নিজের মনের দিকে কোনও কালে খুব বেশী দৃষ্টি দিবার পক্ষপাতী নহে—অন্তরের অপূর্ণ কামনার বোঝা একাই বহন করিয়া চলে নিঃশব্দে—গোপনে!

সময় যতীশ সেদিন উন্মনা চিত্তে চৌরঙ্গী দিয়া তার থিসিসের কথা

ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে—কোনও দিকে হুঁসই নাই! কখন ফুটপাথ ছাড়িয়া পথে নামিয়াছে বেচারী খেয়ালই করে নাই, হঠাৎ পিছন হইতে মোটরের এক ধাক্কা!

আঘাতটা তেমন গুরুতর হয় নাই, তাই রক্ষা! পথের লোকজন হৈ চৈ করিয়া উঠিল, গাড়ীর আরোহীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—কি ক'রে ড্রাইভ্ করেন মশায়, আর একটু হ'লে ভদ্দর লোকের ছেলের—

বিভ্রান্ত যতীশ পিছন ফিরিয়া গাড়ীর ভিতরে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল!—আনন্দ চৌধুরী আর ইলা!

ইলা প্রায় চীৎকার করিয়া বলিল—বাবা, যতীশবাবু!

আনন্দ গাড়ী হইতে নামিয়া যতীশকে একেবারে মোটরে তুলিলেন। কহিলেন—চোখের দৃষ্টি একেবারেই গেছে। নইলে ধাক্কা দিয়েও চিনতে পারলুম না!

হাসিবার চেষ্টা করিয়া যতীশ বলিল—কিছু না, আমার একটুও লাগেনি। পথের জনতার দিকে চাহিয়া বলিল—you need not bother about. I am quite safe.

লোকগুলি কিছুই বুঝিতে পারিল না—বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

মোটর গেল চলিয়া।

ইলা বলিল—বাবাকে রোজ বলি, সোফারটাকে সঙ্গে নিও; তা কিছুতেই উনি শুনবেন না! দেখ দেখি আজ কী হ'ত—

আনন্দ বলিলেন—ভাগ্যে ধাক্কা লাগল, তাইত যতীশের সঙ্গে দেখা! নইলে এই সহরের মধ্যে কোথায় খোঁজ পেতাম? অপূর্ব্বও

তার ঠিকানা দিয়ে যায় নি। হ্যাঁ যতীশ, অপূর্ব্বর খবর কি বলতে পারো ?

—মাসখানেক আগে বিলেত চলে গেছে, তা ছাড়া আর কিছুই জানি না।

আনন্দ বলিলেন—Queer fellow !

ইলা বলিল—আপনি ত কোন খোঁজই করেন নি, ভেবেছিলুম অপূর্ব্ববাবু সেটুকু করবেন ; আজ দেখচি আপনারা দু'জনেই সমান ! কিন্তু তাই বলে ভাববেন না যে, আপনার উপর আমার রাগটা কিছু কম !

যতীশ বলিল—নানা কারণে—

ইলা বলিল—কৈফিয়ৎ দিতে গেলে তাই বলতে হয়। কিন্তু থাক ও কথা, একটু চা করে আনি।

ইলা চলিয়া গেল।

বালীগঞ্জের প্রাসাদতুল্য বাড়ীর মধ্যে—আধুনিক ফ্যাশানে সজ্জিত ঘরের মধ্যে বসিয়া আজ সন্ধ্যার ব্যাপারটা যতীশের কাছে স্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল। যে ইলার কথা সে এতদিন এতপ্রকারে ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছে তারই সঙ্গে আজ এত অনায়াসে দেখা ! মানুষের জীবনটাই যেন অপ্রত্যাশিত ঘটনার সমাবেশ !

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার থিসিস্ কতদূর এগোলো যতীশ ? কবে সাবমিট্ করচ ?

যতীশ থিসিসের কথা জানাইল।

—অপূর্ব্ব এমন হঠাৎ চলে গেল যে ?

—কিছুই জানি না। বল্‌লে কৃষি-বিদ্যা শিখতে চলেচি।

ইলা নিজের হাতেই চা'য়ের সরঞ্জাম লইয়া ঘরে ঢুকিল—নিজের হাতেই সেটুকু পেয়ালায় ঢালিয়া যতীশের হাতে তুলিয়া দিল।

ইলার সমস্ত আচরণে আজ যেন হঠাৎ একটা খুসীর সুর বাজিতেছে! ...হঠাৎ যেন তার অন্তরের অন্তঃপুরে আনন্দের সর্ব্বনাশা বান ডাকিয়াছে। ইলাকে যতীশ ইতিপূর্ব্বে এমন উৎফুল্ল কোন দিনই দেখে নাই!

যতীশ বিস্মিত হইল।

আনন্দ স্যুট্ বদল করিতে নিজের ঘরে গেলেন; ইলা চেয়ার দখল করিল, সকৌতুক চক্ষু দু'টা যতীশের মুখের দিকে নিবদ্ধ করিয়া বলিল—আপনার ওপর আমার কত রাগ, তা আপনি জানেন না!

যতীশ বলিল—কিন্তু কোন অপরাধের কথা আমার স্মরণ হয় না।

—না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি আমাদের,—মেয়েদের সম্বন্ধে কি ভাবেন তাই আমি জান্‌তে চাই।

—মেয়েদের আমি মেয়ে বলেই ভাবি।

—তা জানি, কিন্তু তাদের প্রতি আপনার এত অবজ্ঞা কেন?

—অবজ্ঞা! মোটেই না। মেয়েদের আমি রীতিমত শ্রদ্ধা করি, সেই জন্যেই—

—চুপ করুন। আপনি যে কতবড় নারী-বিদ্বেষী, এ কথা আমার জান্‌তে বাকী নেই।

—কী আশ্চর্য্য! এ সব কথা কেন?

ইলা বলিল—জানি না।—দ্রুতচরণে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বিস্মিত যতীশ কিছুই ঠিক বুঝিল না—মূঢ়, মুগ্ধ চক্ষে তাহার চলিয়া যাওয়ার ভঙ্গিমার দিকে চাহিয়া রহিল।...

আসিবার সময় ইলা বলিল—চলুন, আপনার বাড়ী দেখে আসি, একলা যেতে গেলে আবার কা'র মোটরে ধাক্কা খাবেন।

যতীশ বলিল—সে সম্বন্ধে কিছু ভাববেন না, আমি চিরকাল হেঁটেই পথ চলে থাকি, এবং একলাই যাতায়াত করি।

ইলা বলিল—অর্থাৎ আপনি বলচেন—যাবার কোন দরকার নেই? তা' হলে নিশ্চয়ই যাব না। কিন্তু আবার কবে আসচেন? আবার কি মোটর একৃসিডেন্টের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে?

যতীশ বলিল—কখনই না—ফুরসৎ পেলেই আস্‌বার চেষ্টা করব।

ইলা বলিল—চেষ্টা করবেন না, আসবেন।

—বেশ তাই।

পথে পা দিয়া যতীশের মনে হইল, এটা নিশ্চয় কলিকাতা নয়, আবার তাহার জীবনে দার্জ্জিলিঙের সেই মায়া রজনীর অভিনয় সুরু হইয়াছে। আশ্চর্য্য! দার্জ্জিলিং হইতে আসিয়া, ইলাকে সে চিঠি লিখিতে পারে নাই বলিয়া তার এত রাগ! কিন্তু সেখানে, দুই দিনের বেশী তাদের ওখানে সে যায় নাই, চিঠি লিখিতে সে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধও ছিল না। তবে—?

যতীশ কিছুই বুঝিল না। নারী-হৃদয়ের গতি-বিধি লইয়া ইতিপূর্ব্বে সে বিশেষ কোন চিন্তা করে নাই। তা না করুক, সেদিন রাত্রে পথ চলিতে চলিতে, যতীশের কর্ম্ম-কঠোর রুক্ষ পৃথিবীর মূর্ত্তি যেন যাদু-

মন্ত্রে আর এক রকম হইয়া গেল! মনে হইল—হঠাৎ বসন্ত-বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছে,...যদিও তখন দুরন্ত শীত!

যতীশ চলিয়া যাইবার পর, ইলা বাবার কাছে গিয়া বলিল—যতীশ-বাবু ভারি অদ্ভুত লোক, নয় বাবা?

আনন্দ বলিলেন—কেন বল ত?

—কত লেখা পড়া শিখেচেন, কিন্তু বাইরের দশজনের কাছে তার পরিচয় দেবার জন্যে ব্যাকুল ন'ন—যেন নিজের মধ্যেই ডুবে আছেন। ওঁর গান শুনে তুমিও ত কিছু কম প্রশংসা করনি, কিন্তু সে সম্বন্ধে নিজে তিনি কোন কথাই বলেন না।

আনন্দ বলিলেন—হ্যাঁ, ছেলেটী খুব সংযত।

আনন্দ ভাবিয়াছিলেন, ইলা বুঝি অপূর্ব্বরই পক্ষপাতী, কিন্তু আজ যেন হঠাৎ তাঁহার মনে হইল—সহায়-সম্পদহীন যতীশের প্রতি তাহার ঔৎসুক্য কিছু কম নয়। আনন্দ বুঝিতেন না, যাকে জয় করা কঠিন, যে সহজে ধরা দিবার জন্য ব্যাকুল নয়,—নারীচিত্তের কামনা-ধারা ছুটিয়া যায়—তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া; তাহাকে জয় করিতে পারিলেই নারীর আনন্দ!

ইলার বেলাতেও এই নীতির ব্যতিক্রম হইবার কোন কারণ নাই।

প্রায় আট দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু যতীশের কোন খোঁজ খবরই নাই। ইলা কয়েকদিন প্রত্যাশার স্বপ্নে কাটাইল, মনে মনে ভয়ানক রাগ করিল। লোকটা এমনি দুর্বোধ্য যে, তার ঠিকানা পর্য্যন্ত দিয়া যায় নাই!

ইলার মনের অবস্থা যখন এইভাবে অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে,

গৃহকর্ম্মে মন লাগিতেছে না এবং ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে, সেই সময় হঠাৎ একদিন এক অপরিচিত হস্তলিপি আসিয়া তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। যতীশ চিঠি লিখিয়াছে—

কলিকাতা,

৮নং শিবরতন পাইনের লেন।

ইলা দেবী,

আপনার সহিত দেখা করিব—কথা দিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু এই দশদিনের মধ্যেও সে কথা রাখিতে পারিলাম না বলিয়া নিশ্চয়ই আপনি আমার সততার প্রতি সন্দেহ করিতেছেন। কিন্তু সব কথা শুনিলে, বোধ করি ক্ষমা করা আপনার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হইবে না।

আপনাদের সহিত দেখা হইবার দিন দুই পরেই, বাবা হঠাৎ কঠিন অসুখে পড়িয়া গিয়াছেন; ডাক্তার টাইফয়েড্ বলিয়া সন্দেহ করেন। বাড়ীতে আমার ছোট বোন লক্ষ্মী ব্যতীত দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নাই। আমাদের অবস্থাটাকেও কোন কারণে খুব বেশী স্বচ্ছল বলা চলে না। এই সমস্ত কারণে, এই কয়দিন নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশও হয় নাই। আজ রাত্রে বাবা এইমাত্র শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন, তাই আপনাকে চিঠিটুকু লিখিবার সময় পাইলাম। রাত্রিগুলি বাবার শিয়রে জাগিয়া জাগিয়াই কাটিতেছে।

আনন্দ বাবুকে আমার শ্রদ্ধা ও নমস্কার!

ইতি—

যতীশ।'

চিঠি পাড়য়া ইলার সমস্ত ক্রোধ, সমস্ত অভিমান যেন সূর্য্যের আলোয় রাত্রির অন্ধকারের মত এক নিমিষে দূর হইয়া গেল। চিঠি ছোট, যতীশ তাহার মধ্যে কোথাও এতটুকু উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করে নাই, কিন্তু তাহার অজ্ঞাতেই ইলার চোখের কোণ বহিয়া নিঃশব্দে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া গেল। ইলা চোখ বুজিয়া কল্পনা করিল, দীর্ঘরাত্রি জাগিয়া জাগিয়া যতীশের চেহারা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে, তার ছোট বোন্‌টী খাটিয়া খাটিয়া পরিশ্রান্ত। কোন দিন তাহাদের খাওয়া হইতেছে, কোন দিন বুঝি তা'ও না।

ইলা বিছানায় শুইয়া ছিল,—উঠিয়া পড়িল। বাবার কাছে গিয়া বলিল—যতীশবাবুদের বাড়ী যেতে হ'বে বাবা,—এখুনি।

আনন্দবাবু কি একটা বিলাতী ম্যাগাজিনের ছবির সাগরে ডুব দিয়াছিলেন; কন্যার কথায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—সে কি! কিসের জন্যে— ?

ইলা যতীশের চিঠি দেখাইল।

আনন্দবাবু মুখ ভার করিয়া বলিলেন—তা'হক, এমন ঘনিষ্ঠতা যতীশের সঙ্গে আমাদের নাই,—যার জন্যে তোমাকে এখুনি সেখানে ছুট্‌তে হ'বে। আর কোন দরকার আছে বলেও মনে হয় না।

ইলা অভিমান-উদ্গত চক্ষু দুইটিতে অনুনয় ভরিয়া বলিল—কেবল ঘনিষ্ঠতার দাবী নিয়েই বুঝি লোকের বাড়ীতে যেতে হয় বাবা; মানুষের প্রয়োজন বুঝি কিছুই নয় ?

ইলার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিল। আনন্দ কি বলিবেন, কিছুই সহসা ঠিক করিতে পারিলেন না। আশ্চর্য্য !—ইলাকে

এত দিনেও তিনি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই! ইলার কান্না দেখিয়া তাঁহার পিতৃ-হৃদয় ব্যথিত হইল; বলিলেন—তোমার যখন একান্ত ইচ্ছে, তখন আমি বাধা দেব না। সোফারকে নিয়ে তুমি ঘুরে এস।

ইলা আব্দারের স্বরে বলিল—না, তোমাকেও যেতে হ'বে।

—আমার হাতে ঢের কাজ।

—এটাও খুব খেলো কাজ নয় বাবা, তোমাকে যেতেই হ'বে। নইলে দিবারাত্রি—তোমার কাণের কাছে এমনি চীৎকার করব যে, তোমায় এ পাড়া ছেড়ে পালাতে হ'বে।

বিপত্নীক ধনী পিতার একমাত্র কন্যা ইলার জেদ কত প্রবল সে কথা আনন্দর অপেক্ষা কেই বা অধিক জানে।

ম্যাগাজিনখানা মুড়িয়া রাখিয়া বলিলেন—তোর মত মেনে চলতে-চলতেই জীবনটা গেল! একটু স্বস্থির থাকতে—দিবিনি! চল্, কোথায় যেতে হ'বে।

রাধাবল্লভের টেম্পারেচার দেখিয়া এবং ফলাফল চার্টে টুকিয়া লইয়া যতীশ তাঁহার মাথার শিয়রে গিয়া বসিল।

লক্ষ্মী মেঝেয় বসিয়া বেদানার রস নিঙড়াইতে ছিল, এমন সময় হঠাৎ বাহিরে মোটরের হর্ণ!

যতীশ বলিল—দেখ ত' লক্ষ্মী, আমাদের বাড়ীতে কি না।

দুই মিনিট পরে লক্ষ্মী প্রায় ছুটিতে ছুটিতে ভিতরে আসিয়া বলিল,—হ্যাঁ দাদা, আমাদের বাড়ীতে, আমি ওদের চিনি না। বললে—যতীশবাবু বাড়ী আছেন?

যতীশ বলিল—তা' হ'লে তুই একটু বাবার মাথার কাছে বোস্, আমি দেখে আসি—

কিন্তু দেখিয়া আসিতে আর হইল না, যতীশকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া দিয়া ইলা ঘরে ঢুকিল, পিছনে আনন্দ চৌধুরী।

যতীশ হঠাৎ কথা বলিতেই ভুলিয়া গেল! আনন্দ নিজেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন।

—তোমার চিঠি পেয়ে ইলা কিছুতেই ছাড়লে না।—কেমন আছেন উনি?

—কিছুই বোঝা যাচ্চে না। দিন কয়েক না কাটলে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না।

ইলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘরখানি দেখিতেছিল;—বহুকাল ঘরের

সংস্কার হয় নাই তাহা দেখিলেই বুঝা যায়; ঘরের আসবাব-পত্রেও কোথাও প্রাচুর্য্যের পরিচয় নাই—বরং সযত্ন-সজ্জিত জিনিস গুলির আড়াল দিয়া সুস্পষ্ট দারিদ্র্যই উঁকি মারিতেছে।

যতীশ নিজের শ্রীহীন ঘরের সহিত ইলাদের ঐশ্বর্য্যময় প্রকোষ্ঠের তুলনা করিয়া মনে লজ্জা অনুভব করিল, কিন্তু ইলা নিজে উৎকণ্ঠিত চিত্তে ছুটিয়া আসিয়াছে ভাবিয়া, তার সমস্ত অন্তর-তল অকস্মাৎ এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে ভরিয়া গেল।

যতীশ বলিল—আমার সামান্য চিঠিখানা যে আপনাদের এতখানি ব্যাকুল করে তুলবে, তা জানলে কখনই সে কাজ আমি করতাম না। কোথায় যে আপনাদের বসবার জায়গা দেব, তাই আমি ভেবে পাচ্ছি না।

ইলা বলিল—আপনি যখন আমাদের ডেকে পাঠান নি—আমরা নিজেই এসেছি, তখন বসবার জায়গাও আমাদেরই করে নিতে হ'বে বৈকি।

আনন্দবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার যদি অসুবিধে হয় বাবা, তুমি একটু গাড়ীতে গিয়ে বস। আমি এই খানেই বসচি—

ইলা মাটীর উপরেই লক্ষ্মীর পাশে বসিয়া পড়িল। লক্ষ্মীর হাত হইতে পেয়ালাটা টানিয়া লইয়া বলিল—দাও না ভাই, আমি করে দিচ্ছি।

বিস্ময়ে অভিভূত লক্ষ্মী কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া দাদার মুখের দিকে চাহিল।

যতীশ যার পর নাই বিব্রত হইয়া বলিল—কী আশ্চর্য্য!—না, না, সে কিছুতেই হ'তে পারে না...ও বেশ পারবে...

হাসিয়া ইলা বলিল—আমিও যে বেশ পারব না, তাই বা কোত্থেকে জান্‌লেন ? বলিয়া সে রস নিঙড়াইতে লাগিল।

আনন্দ দেখিলেন, আশা নাই! মনের বিরক্তি মনে চাপিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। যতীশও তাঁহার সঙ্গেই গেল।

ইলা লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিল—তোমাদের আর সব কাজ কে করে ভাই ?

লক্ষ্মী বলিল—বামুন শুধু রাঁধে, আর সব আমিই করি।

ইলার চক্ষু যেন জলে ভরিয়া উঠিল। বলিল—আর সব তুমিই করো ? বড় কষ্ট হয়, না ?

লক্ষ্মী বলিল—না আমার কষ্ট হয় না ; মা মারা গিয়ে পর্য্যন্ত আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।

ইলা খানিক মৌন হইয়া বসিয়া রহিল তার পর উঠিয়া গেল বাহিরে। যতীশ আনন্দর সঙ্গে কথা বলিতেছিল।

ইলা বলিল—তুমি যে ডাক্তারকে দেখাও, তাঁকে আনলে হয় না বাবা ?

আনন্দ বলিলেন—হ'বে না কেন ? কিন্তু—

—কিন্তু নয় বাবা, কাল তাঁকে এখানে নিয়ে এস।

যতীশ বলিল—তার দরকার নেই। ভাল ডাক্তারই দেখচেন ওঁকে।

ইলা বলিল—তা হ'ক, তবু আর একজন দেখা ভাল।

যতীশ বুঝিল না যে, তার ব্যয়-সংক্ষেপ করাই ইলার উদ্দেশ্য।

আনন্দ বলিলেন—তা হ'লে আজ যাওয়া যাক যতীশ, আবার একদিন আসা যাবে।

ইলা বলিল—আমার একটু দেরী হ'বে বাবা, তুমি বরং বেড়িয়ে ফেরবার সময় আমায় নিয়ে যেও।

যতীশের সামনে আনন্দ প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না; মেয়ের খেয়াল যখন চাপিয়াছে, তখন সে থাকিবেই।

আনন্দর মোটর চলিয়া গেল।

ইলা বলিল—অদ্ভুত মানুষ আপনি! এতদিন ওঁর অসুখ করেচে, কিন্তু খবর দিলেন আজ আট দিন পরে! লক্ষ্মী বেচারী খেটে অস্থির হয়ে গেল!

যতীশের হৃদয় যেন হঠাৎ কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে! ইলা তাহার ঘরে!—এ যেন তাহার সেই দাঁত বাহির করা, দারিদ্র্য-কুৎসিত ঘরই নয়, এ যেন বসন্ত-রাত্রির সুখ-স্বপ্নে দেখা একটা পরম রমণীয় দৃশ্য! আনন্দের আবেগে যতীশ আত্ম-বিস্মৃত হইল।

ইলা বলিল—বাইরে দাঁড়িয়ে কোন লাভ নেই, ভিতরে চলুন।

ঘর ক'খানি দেখিয়া ইলা বলিল—কি বিচ্ছিরি করে রেখেছেন আপনার পড়ার ঘর খানাকে,—বইয়ের স্তূপের মধ্যে থাকা, টেবিলের ওপর গোটাচার আধ-পোড়া মোমবাতী, তিন ডজন পুরাণো নিব্—চারটে মুখ-ভাঙ্গা পেন্সিল...

যতীশ বলিল—আগে লক্ষ্মীর ওপরেই ও সব সংস্কারের ভার ছিল, কিন্তু এই ক'দিনে—

—তা ঠিক, একা ওই বেচারীকেই দোষ দেওয়া যায় কি করে! চলুন দেখি, যদি ওগুলোকে একটু tidy করে তুলতে পারি।

লজ্জায় মরিয়া গিয়া যতীশ বলিল—দোহাই আপনার, কাল সকালেই

নিজের হাতে আমি ওগুলোর সংস্কার করব, আপনি ও-দিকে মন দেবেন না।

ইলা বলিল—তাতে আমার প্রাণান্ত পরিশ্রম হ'বে না, আপনার বিব্রত হ'বার দরকার নেই এতটুকু!...ও-গুলো গুছিয়ে না রেখে যেতে পারলে, রাত্তিরে আমার পক্ষে ঘুমোনই কষ্টকর হ'বে।—জিনিস অগোছাল আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না।

যতীশ হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল এবং লক্ষ্মীর কাছে আসিয়া বলিল—তুই ও ঘরে যা, আমি বাবার কাছে বসচি।

ইলা ও-ঘর হইতে বলিল—আমি একলাই পারব, helping hand চাই না।

এ ঘর হইতে যতীশের পড়ার ঘরের প্রায় সমস্তটাই চোখে পড়ে। যতীশ বসিয়া বসিয়া ইলার কর্ম্ম-চঞ্চল মূর্ত্তিখানি দেখিতে লাগিল। তার বেশে আজ কোন পারিপাট্য নাই, চুলগুলি রুক্ষ—সংস্কার হয় নাই, পরণে কালাপাড় দিশী শাড়ী! এই যেন ইলার সত্যকার রূপ—এতদিন যে বেশে তাহাকে দেখা গিয়াছে, সেটা শুধু বহিরাবরণ।

ইলাকে সে একদিন নিতান্ত অসার সৌখীন প্রজাপতি বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহাকে যে এমনি সাধারণ ভাবে, গৃহ-কাজের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে, তা সে ভাবে নাই। সেই জন্য ইলাকে সে নিভৃত মনোলোকে এক অবাস্তব স্বপ্ন-রূপে স্থান দিয়াছিল; আজ দুই চোখে বিস্ময়ের ঘোর মাখিয়া যতীশ দেখিল—গৃহ-লোকে তার স্থান কাহারও পশ্চাতে নয়, আভিজাত্যকে বিসর্জ্জন দিতে তার এতটুকু কুণ্ঠা নাই।

মিনিট পনের পরে যতীশ আবার যখন নিজের ঘরে প্রবেশ করিল, তখন তার সে মূর্ত্তি আর নাই।—কাহার যাদুদণ্ড স্পর্শে সেটা হঠাৎ সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে। পড়াশুনা এবং শয়ন সেই একটী ঘরেই চলিত; যতীশ দেখিল, শুধু পড়ার টেবিলটা নয় তার বিছানা পর্য্যন্ত আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

লক্ষ্মীকে কাছে ডাকিয়া ইলা বলিল—বাবার অসুখ সেরে গেলে, দাদার সঙ্গে আমাদের ওখানে যেও—কেমন?

লক্ষ্মী সম্মতি দিল।

রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ইলা সে দিন যতীশের বাড়ীতে কাটাইল। যতীশের ছোট ভাইদের সঙ্গে পড়াশুনা লইয়া তর্ক করিল, ষ্টোভ্ জ্বালিয়া রাধাবল্লভের জন্য দুধ গরম করিয়া দিল এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া গেল যে, বাবাকে লইয়া কাল আবার আসিবে।

ইলা চলিয়া গেলে যতীশের মনে হইল—বাড়ীটা হঠাৎ অত্যন্ত শূন্য হইয়া গিয়াছে, যদিও এতকাল ঠিক এই কয়টী লোকই সেখানে বাস করিতেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইলা যেন তা'দের পরিচয়কে শত বর্ষের পরমায়ু দিয়া গেল।

রাধাবল্লভ চোখ মেলিয়া চাহিলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন—কারা এসেছিল বাবা, যতীশ?

—আপনাকে দেখতে এসেছিলেন। দার্জ্জিলিঙে এঁদের সঙ্গে আমার চেনা হয়...

আরও কিছু বলিবার বাসনা তাঁহার ছিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাঁহার চোখে আবার ঘুমের ঘোর নামিল।

লক্ষ্মী দাদার কাছে আসিয়া বলিল—খুব বড় লোক ওরা, নয় দাদা ?

—কি করে বুঝলি তুই ?

—বাঃ, অত বড় মটর রয়েচে যে !

—বড় মটর থাকলেই বড় লোক হয়, না রে ? এঁরা সত্যিই বড় লোক—মনের দিক দিয়ে।

—হ্যাঁ দাদা, ইলা দি' খুব ভাল মানুষ, নয় ?

—হুঁ। আর তুই বুঝি এই ক'ঘণ্টার মধ্যেই ওঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেলেচিস ?

—বারে ! ইলাদিই ত' বললে—তুমি আমার ছোট বোন্ হও—আমার কাছে লজ্জা করতে নেই। দাদার খাওয়া-দাওয়ার যাতে কষ্ট না হয়, সে দিকে নজর রেখ'—

—তোকে তিনি এই কথা বললেন ?

—আমি বুঝি মিথ্যে কথা বল্‌চি ?

যতীশ বলিল—না, মিথ্যে কথা বলবি কেন—তবু একবার জেনে নিলাম। আচ্ছা, তুই সতীশ আর নরেশকে নিয়ে খেয়ে আয়, আমি বাবার কাছে আছি।

১১

রাধাবল্লভের রোগের সূত্র ধরিয়া এই দুইটী পরিবার সহসা যেন এক হইয়া গেল। ইলা প্রত্যহ একবার করিয়া আসিতে আরম্ভ করিল এবং যেন তাহারই শুভেচ্ছায় যতীশের বাবা সারিয়া উঠিতে লাগিলেন।

একটী মাস কাটিয়া গেল।

বহু শঙ্কা, বহু দুর্ভাবনা এবং বহু আনন্দের একটী মাস!

রাধাবল্লভ আরোগ্য হইলেন।

ইলার হাত ধরিয়া বলিলেন—তুমি আর জন্মে আমার মা ছিলে—তাতে আর কোন সন্দেহ নেই!—না, এমন সেবা কেবল মায়েরই সম্ভব।

ইলা বলিল—অমন করে প্রশংসা করলে আমার নিশ্চয়ই গর্ব্ব হ'বে; তা হ'লে আর আসতে পারব না।

রাধাবল্লভ হাসিতে লাগিলেন।

এই এক মাসের মধ্যে যতীশ থিসিস্ রিভাইজ্ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে; ইলার তাড়া না থাকিলে এত শীঘ্র সে কাজ তাহার দ্বারা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। যতীশ থিসিস্ পাঠাইয়া অনেক অসম্ভব মনোরম দৃশ্য কল্পনা করিতে লাগিল। যে দৃশ্য বহুযুগ ধরিয়া বহু মানবের মনে ঘর বাঁধিবার সাধ সৃষ্টি করিয়াছে—একেকে যুক্ত করিয়াছে,—দুইকে বহু!

কিন্তু ইলা এমনি অদ্ভুত মেয়ে যে, রাধাবল্লভ পথ্য পাইবার পর দিন হইতে সে আশা বন্ধ করিয়া দিল—তার কোন খোঁজ খবরই আর রহিল না। দিন পাঁচেক আশায় আশায় কাটাইয়া দিয়া যতীশ নিজেই আনন্দ চৌধুরীর বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিল। ভাবিয়াছিল, যথাসাধ্য উচ্ছ্বাসের সহিত ইলার সেবা-পরায়ণতার প্রশংসা করিবে, কিন্তু ইলার শুষ্ক, গম্ভীর মুখ দেখিয়া তার সব কল্পনাই যেন গোলমাল হইয়া গেল।

—আপনি আমার অভদ্রতার জন্যে নিশ্চয়ই রাগ করেছেন ?

—না, রাগ কিসের ?

—তবে যে আর একদিনও গেলেন না ?

—চিরকালই যে যেতে হ'বে তার মানে কি ? আমার শরীর আজ বড়ই খারাপ—বাবাও বাড়ী নেই ; আর একদিন আসবেন।

যতীশ বলিল—আপনার অসুখ করে নি, নিশ্চয়ই কোন কারণে আপনি আমার উপরে অসন্তুষ্ট হয়েচেন, কারণটা কি না শুনে আমি যাব না।

যতীশ এমনি দাবীর সুরে কথা বলিল যে, সে নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল, ইলাও !

ইলা বলিল—সমস্ত কাজের কৈফিয়ৎই আপনার কাছে দিতে হ'বে তেমন কোন কথা ছিল না।...সত্যি আমি অসুস্থ...কোন রূঢ় কথা বললে দুইজনকেই তার জন্যে কষ্ট পেতে হ'বে।

গোধূলির অস্পষ্ট আলোয় যতীশ দেখিল, ইলার চোখের কোণে একটী অস্পষ্ট অশ্রু-ধারা !

সত্যই ইলা অদ্ভুত!

বিস্মিত যতীশকে ফিরিতে হইল।

দিন দুই পরে রাধাবল্লভ বলিলেন—হ্যাঁ যতীশ, ইলা যে আর আসেন না?

যতীশ বলিল—বল্‌তে পারি না।

—তুমি এর মধ্যে তাঁদের সঙ্গে দেখা কর নি?

যতীশ চুপ করিয়া রহিল।

—কিন্তু যাওয়া তোমার একান্তই উচিত ছিল যতীশ! ছি ছি, ভারি অন্যায় করেছ! চলবার শক্তি থাকলে আমি নিজেই একদিন যেতুম—! না, শীগ্‌গীরই একদিন তুমি গিয়ে তাঁদের আমার হয়ে নিমন্ত্রণ করে এস।

যতীশ রাগের স্বরে বলিল—বাড়ীতে বসবার নেই জায়গা, 'নিমন্ত্রণ করে এস!'...হয়ত তারা কেউ আসবেই না।

রাধাবল্লভ বলিলেন—না, না, ইলা সে মেয়েই নয়! যদি তাই হয় যতীশ, তা হ'লে সে উপযাচিকা হ'য়ে তোমার রুগ্ন বাপের সেবা করতে আসবে কেন? আমি ঠিক জানি, আমার নাম শুনলে সে কখনই চুপ করে থাকতে পারবে না।

যতীশ বলিল—দেখব একবার বলে।

সেই দিন রাত্রিতেই যতীশ ইলাকে চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিল,—

Miss Choudhuri,

কি কারণে সে দিন আপনি আমার প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন, তা আমি এত দিনেও কল্পনা করতে পারি নি। যে ঘনিষ্ঠতা আমি

কোন দিন আপনার কাছে প্রত্যাশা করিনি—সেটা আপনি নিজেই তুলে দিয়েছেন—আমার হাতে। আমার অযোগ্যতা প্রতিপদে অনুভব করলেও, আমি তা' গৌরবের সঙ্গেই গ্রহণ করেচি।

জীবনকে আমি চিরকাল অত্যন্ত সাদা ভাবেই গ্রহণ করে এসেছিলাম, আমার সংসার-চক্রের নিত্যকার পেষণে, কোন দিনই সেটাকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তুলতে চেষ্টা করি নি। কিন্তু এ কথা আজ অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হয়, যে, আমার নিতান্ত সাধারণ জীবন-যাত্রাকে রামধনুর রঙে আলো করে তুলেছে—আপনারই দাক্ষিণ্য! আমি অর্থ-নীতির ছাত্র, কাব্য-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ পেয়েচি খুব কমই; এর চেয়ে ভাল ভাবে মনোভাব ব্যক্ত করবার সঙ্গতি আমার নেই!

কোন দিন, কারণে আপনাকে ক্ষুন্ন করবার চেষ্টা সম্প্রতি আমি করেছি কি না, তা মনে করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য! অসাবধানতার অপরাধ ক্ষমা করবার শক্তি আপনার আছে, আমি তা বিশ্বাস করি।

দেখুন, মানুষ জীবনকে যে ভাবে গ্রহণ করে, সেই ভাবেই সে তাকে নিতে পারে। আমি চিরকাল দারিদ্র্য ও দুঃখের মধ্যে মানুষ হয়েছি, এক অপূর্ব্ব ছাড়া এত বড় সহরে আমার বন্ধু কেউ ছিল না—নেই। সকল দুঃখকেই আমি নিঃশব্দে সহ্য করতে পারি। সুতরাং আপনি যে শাস্তিই আমাকে দেন, আমি তাও নিঃশব্দেই সহ্য করব। কিন্তু সে শাস্তি যেন ভুল বোঝার জন্যে না হয়।

আমি যে এমনি করে লিখতে পারি, সে ধারণা কোন কালেই ছিল না। প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পেলে তা মার্জ্জনীয় হয় যেন।

বাবা চান, আপনাদের একদিন এখানে নিমন্ত্রণ করতে। যাওয়া উচিত হ'বে কি না ঠিক করতে না পেরে, দেড় ঘণ্টা পরিশ্রম করে লিখে ফেললুম—এই চিঠি! অনুমতি পেলেই যাব।

বেশ বুঝতে পেরেছি, চিঠিখানার মধ্যে এমন অনেক কথা বলেছি, যা না বললেই বুঝি ঢের বেশী শোভন হ'ত...কিন্তু সেগুলিকেও বাদ দিতে ব্যথা লাগচে।

আনন্দবাবুকে আমার নমস্কার—' আপনাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি—'

চিঠি লিখিয়া যতীশ থামিয়া উঠিল। বহুক্ষণ বসিয়া বসিয়া ভাবিল, সত্যই এটা পোষ্ট করা উচিত হইবে কি না। অনেকবার অনেক রকমে চিন্তা করিয়া ঠিক করিল—না, দেওয়াই ঠিক! দিনের আলোয় রাত্রির উচ্ছ্বাস দেখিয়া নিজেই লজ্জিত হইবার ভয়ে, রাত্রেই চিঠিখানা যতীশ নিজের হাতে ডাক-বাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিল।

ভাবিয়াছিল, ফেরৎ ডাকেই চিঠির জবাব আসিবে, কিন্তু সম্পূর্ণ চব্বিশটা ঘণ্টা কাটিয়া গেলেও যখন কোন সংবাদ আসিল না, তখন যতীশ বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

রাধাবল্লভ জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ যতীশ, ইলাদের ওখানে কি এর মধ্যে...

যতীশ বলিল—না।

রাধাবল্লভ বলিলেন—কেন? এর মধ্যে যাওয়া তোমার নিশ্চয় উচিত ছিল।

যতীশ বলিল—সময় পাই নি।

ইহা ছাড়া বলিবার ছিলই বা কি!

সেই দিন সন্ধ্যায় যতীশ বাড়ী ফিরিলে, লক্ষ্মী তার হাতে একখানি চিঠি দিল। কিছুক্ষণ আগেই আসিয়াছে।

ইলার চিঠি—ইলার নিজের হাতে লেখা,...তলায় নাম লেখা। কি চমৎকার হাতের লেখা ইলার—তার মতই সুশ্রী!

আশঙ্কায় ও আনন্দে ব্যাকুল মন লইয়া যতীশ নিজের ঘরে ঢুকিল।

ইলার প্রথম চিঠি—যতীশের জীবনে প্রথম নারী-হস্তলিপি।...

আনন্দ ধাম
বালীগঞ্জ

যতীশবাবু,

আপনার চিঠি যথা সময়েই এসে পৌছেচে—কিন্তু নানা কারণে তার উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি। মনের সঙ্গে অনেক দ্বন্দ্ব করে আজ চিঠি লিখতে বসলাম। যখন লিখতে বসেছি, তখন সমস্ত কথাই খুলে বলব। চিঠির দীর্ঘতার জন্যে আগেই ক্ষমা চেয়ে রাখচি।

দশ বৎসর আগে আমার মায়ের মৃত্যু হয়—তখন আমি খুব ছোট ;—সে কথা মনেও পড়ে না। তারপর একমাত্র বাবাকে আশ্রয় করেই এই ন'বছর কেটেছে। নিজের খেয়াল ও খুসী-মত এতদিন জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে এসে আমার একটা ধারণা জন্মেছিল, যে, আমার কোন কামনাই পৃথিবীতে অপূর্ণ থাকবার নয়! কিন্তু আজ দেখচি, আমার পায়েও বেড়ীর বাঁধন!...

যতীশের চোখের দৃষ্টি যেন সহসা ঝাপসা হইয়া আসে—চোখ দু'টো অসম্ভব রকম জ্বালা করিতেছে। চিঠির অবশিষ্ট অংশে কি কথা লেখা আছে কে জানে?—যতীশের ভয় হয়।

তবু অবাধ্য মন কিছুতেই চিঠিখানা শেষ না করিয়া পারিল না।

—আপনার বাবার অসুখের সংবাদ পেয়ে আমি নিজেই ছুটে গিয়েছিলাম আপনাদের ওখানে। কেন গিয়েছিলাম, তা এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন; সেটা নিশ্চয়ই আমার মনের বিশেষ একটা দুর্ব্বলতা।...যাই হ'ক, একটা কথা আপনি বোধহয় জানেন না, আমি প্রায় এক মাস ধরে যে আপনাদের ওখানে যাতায়াত করেছিলাম, তা'তে বাবার বিশেষ মত ছিল না। তবু তিনি বেশী আপত্তির উপায় খুঁজে পান নি, কারণ আপনার বাবা ছিলেন তখন পীড়িত।

তা ছাড়া সহজে তিনি আমাকে দুঃখ দিতে চান না।

কিন্তু আজ তাঁর মন এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যে, আমার অনুনয়, অশ্রুজল—সবই সেখানে নিষ্ফল!

দৈবক্রমে আমি বড়লোকের ঘরে জন্মেছি,—তারই শাস্তি আমায় গ্রহণ করতে হ'বে আজ।

তিনি সন্দেহ করেন, আমি আপনাদের প্রতি একটু বেশী সহানুভূতি প্রকাশ করেচি, যা থেকে নাকি অনেক কথাই অনুমান করা চলে এবং যা' আমার পক্ষে একেবারেই অনুচিত।

তাঁর অনুমান সত্য কি মিথ্যা সে নিয়ে এখানে তর্ক তুলে লাভ নেই, তাঁর নিষেধ,-আজ্ঞাটাই এখানে চরম সত্য!

সত্যি বলুন ত, যার বাপের বার্ষিক আয় প্রায় লক্ষ টাকা—সেই বাপের যে একমাত্র মেয়ে, সে কি যার তার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে পারে, না রাখাটাই তার পক্ষে উচিত? আপনার কি আছে? বড় জোর উঁচু বলিষ্ঠ মন, অগাধ পাণ্ডিত্য, কিন্তু বাস্তব জীবনে আপনার দান

কতটুকু ? আপনি হয়ত জানেন না, আমাদের জগৎটা চলা-ফেরা করে সোণা রূপো ছড়ান পথ দিয়ে, সেখানে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, বেশের পারিপাট্য এবং ব্যাঙ্কের হিসেবের দাম—মনুষ্যত্ব ও পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশী।

—আশা করি এই অদ্ভুত জগতের সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল না ; আমিই তার খপর দিলুম বলে, নিশ্চয়ই আপনি আমায় ধন্যবাদ দেবেন।

আবার এক দিক দিয়ে, বাবার দিক দিয়ে ভাবলে, তাঁর ওপরেও আমি বিশেষ অসন্তুষ্ট হ'তে পারি না। একমাত্র মেয়েকে একটা ব্যাঙ্কের মালিকের সঙ্গে পরিচিত না দেখে গেলে তাঁর যে স্বস্তি নেই। স্নেহ-ভালবাসার ধর্ম্মই এই, তার এক চোখ কাণা।

এই সমস্ত কারণেই আমি এতদিন নীরব ছিলাম—আপনাকে উত্যক্ত করবার সাহস আমার হয় নি। কারণ, চিঠির মধ্যে যে কথা গুলি লিখ্‌লাম, তা শ্রবণ বা মন কোন কিছুর পক্ষেই বিশেষ সুখকর নয়।

সেদিন সন্ধ্যায় আপনার প্রতি যে অভদ্র ব্যবহার করেছিলাম তার উৎস কোথায়, সে কথা অনুমান করে নেওয়া হয়ত এরপর আপনার পক্ষে খুব কঠিন হবে না।

দার্জ্জিলিঙের পথে কেন যে হঠাৎ সে দিন আপনাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, সে কথা বলবার শক্তি আমার নেই ; কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই যদি আপনার বা আর কা'রোর ব্যথার কারণ হয়ে থাকি, সে জন্যে ক্ষমা চাই।

আপনি ক্ষমা চেয়ে আমার লজ্জার বোঝাই কেবল ভারি করে তুলেচেন! আপনার বাবার কথা রাখতে পারলে আমি কত বেশী খুসী হ'তাম সে কেবল আমিই জানি—কিন্তু উপায় নেই! বাবাকে দুঃখ দিতে আমার দুঃখ হয়।

এ জীবনে আবার কবে আপনাদের ওখানে যেতে পারব, তা কে জানে। আশা করি, যাবার পথ যাতে মুক্ত হয়, বাবার চোখে আপনাকে যাতে মস্ত একটা কিছু বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন—সেই চেষ্টাই আপনি করবেন।

আমি সেই দিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

—ইলা।

চিঠি পড়িয়া যতীশ বিস্ময়ে, বেদনায় যেন অসাড় হইয়া গেল। এ যেন তার জটিল অর্থ-নীতির সমস্যা হইতেও বহু গুণে কঠিন!

প্রথমে যতীশ কিছু বুঝিতেই পারিল না। বার বার সেটাকে পড়িয়া গেল। তারপর হঠাৎ কে যেন তাহার চেতনায় আঘাত করিয়া জানাইয়া দিয়া গেল—ইলা তাহাকে ভালবাসে! অনেক চেষ্টা করিয়া, অনেক আবরণ দিয়াও ইলা সেটাকে গোপন করিতে পারে নাই। পূর্ণিমার রাত্রে আকাশ হাল্‌কা মেঘে ছাইয়া গেলেও, জ্যোৎস্নার জ্যোতি যেমন ফাঁকে ফাঁকে আত্ম-প্রকাশ করিতে থাকে, ইলার এই চিঠিখানাও যেন তেমনি।

এই আবিষ্কারের ফলে যতীশ আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল।

'আমি সেই দিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।' যতীশ মনে মনে বলিল,

সে কোন্ দিন? কি করিলে এ বাড়ীতে ইলার প্রবেশের পথ চিরকালের মত মুক্ত হয়?

আনন্দ তাহাকে অনেক আঘাত দিয়াছেন বটে, কিন্তু ইলার সেই নিঃশব্দ স্বীকৃতি, যতীশকে তার বহু গুণ আনন্দে ভরিয়া দিয়াছে। যতীশ যেন সম্রাট্, তিন লোকে তার দোসর নাই; সে যেন জ্যোতিষ্ক সভার মাঝে চির জাগ্রত সূর্য্য!

যতীশ দরিদ্র, তার একটা কাণা কড়ি সম্বল নাই, এ'কথা সত্য! কিন্তু এই অন্তরায় কি কোন রকমেই দূর করা করা যায় না? দুনিয়ার বাজারে টাকার সম্মান এত বেশী, প্রতিভার দর একেবারেই কিছু না?

কি জানি। তবু যতীশ চেষ্টা করিবে, দেখিবে এ' বাধা ঘুচান যায় কি না।

ইলার প্রতীক্ষাকে সে অর্থহীন, নিস্ফল করিবে না। কিন্তু সে কত দিনে?

১২

পাঁচ বৎসর পরের কথা বলিতেছি।

পাঁচ বৎসর—সঙ্কীর্ণ মানব-জীবনের একটা প্রকাণ্ড অধ্যায়। অথচ, বিরাট কালের সামান্য একটা ভগ্নাংশ মাত্র।

এই ক' বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে কত বড় বড় পরিবর্ত্তন হইয়া গেল তার হিসাব কে রাখে?—কত নদী হয়ত গেল শুকাইয়া, কত গ্রহ চিরকালের কত নিভিয়া গেল, মত জন্ম, কত মৃত্যু।

বহিঃ-পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখিলে এই পরিবর্ত্তন সহসা চোখে পড়ে না—মনে হয় সব ঠিকই আছে।

কিন্তু যাহারা দেখিতে জানে, তাহারা বুঝে, বুড়ী পৃথিবীর মাথায় আর এক গাছি চুলে পাক ধরিয়াছে।

মানুষের জীবনের মধ্যে বিস্ময়ের উপাদান যত বেশী করিয়া আছে, তেমন বোধ করি সংসারের আর কোন কিছুতেই নয়।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাহারা কোন দিন ঘর বাঁধিবার কল্পনাও করে নাই, আজ তাহারাই হয়ত একখানি শান্ত, সুখনীড়ের মধ্যে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে দিন যাপন করিতেছে। সে দিন যে প্রাণের মধ্যে ঝড়ের দুরন্ত বেগ লইয়া পৃথিবী জয়ের স্পর্দ্ধা করিয়াছিল—তাহারই ললাটে আজ হয় ত অবসাদ ও ক্লান্তির কালিমা।

সমস্ত পৃথিবীটাই এই বৈষম্য ও পরিবর্ত্তনের ইতিহাস।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে কয়টী প্রাণীকে লইয়া নিতান্ত কৌতুক-ছলে

এই কাহিনীর সুরু হইয়াছিল, তাহাদের জীবনেতিহাসেও যদি প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন ইতি মধ্যে ঘটিয়া থাকে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

সমস্ত জীবন-ধারা এই ভাবেই বহিয়া চলিয়াছে।

পাঁচ বৎসর পরে অপূর্ব্ব আবার দেশের মাটীতে পা দিল। ভাবিয়াছিল, সবই হয়ত অদ্ভুত হইয়া গিয়াছে, চিনিবার কোন উপায় থাকিবে না। কিন্তু আসিয়া দেখিল, মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার কোন রকম পরিবর্ত্তন হয় নাই—বেলা দশটায় ফুটপাথ্ জনাকীর্ণ করিয়া তেমনি কেরানীর দল শুষ্ক, বিবর্ণ মুখ লইয়া কাজে চলিয়াছে, আকাশ লণ্ডনের মত মেঘাবৃত নয়, তীব্র, তীক্ষ্ণ সূর্য্যালোকে জ্বলিয়া যাইতেছে; মাঠে তেমনি শ্যামল তৃণ-শোভা।

কিন্তু কত বড় বিস্ময় যে অপূর্ব্বর জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল, সে কথা অপূর্ব্ব জানিত না।

প্রথম দিনই অপরাহ্নে ট্যাক্সি চড়িয়া যতীশের বাড়ীর সামনে পৌছিল।

কিন্তু বাড়ীটাকে আর চিনিবার উপায় নাই। ছিল একতলা, এখন দ্বিতল হইয়াছে—যেন সে বাড়ীই নয়।

অপূর্ব্ব যতীশের নাম ধরিয়া বারম্বার চীৎকার করিবার পরেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। পাশেই বাড়ীর অধিকারীর পৃথক বাড়ী। অপূর্ব্ব সেখানে খোঁজ করিয়া জানিল, যতীশ প্রায় তিন বৎসর আগে বাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে।

—কোথায় গেছে জানেন?

—তখত ত' বলেছিলেন, ইটালীর ও-দিকে যাচ্ছেন—ও বাড়ীতে আর কুলোল না কি না।

অপূর্ব্ব বিস্মিত হইয়া বলিল—যতীশ কি বিয়ে করেচে নাকি?

—শুধু বিয়ে। সেই সঙ্গে প্রফেসারীও।

অপূর্ব্ব অত্যন্ত আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। যতীশ ভাল চাকরী পাইয়াছে—বিবাহ করিয়া গৃহ-নীড় রচিয়াছে, এ খপরে অপূর্ব্ব সুখী হইবে না ত হইবে কে?

বলিল—বাড়ীর নম্বরটা আপনার মনে আছে?

বাড়ীর অধিকারী সেটা স্মরণ করিয়া রাখেন নাই বটে, কিন্তু তাঁর বাড়ীর ভিতরে যতীশের বাড়ীর নম্বরটা জানা ছিল; সংবাদ, পাইয়া অপূর্ব্ব সেই ট্যাক্সিতেই ইণ্টালী ছুটিল।

যতীশ বিবাহ করিয়াছে, সংসারী হইয়াছে—আর সে?

না, সে সব কথা ভাবিবার দিন আজ নয়।

আজ বন্ধুকে প্রাণ খুলিয়া অভিনন্দিত করিবার দিন।

গাড়ী যেখানে থামিল, সে বাড়ীখানি নিতান্ত ছোট নয়।

গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিয়া অপূর্ব্ব ডাকিল—যতীশ আছ? যতীশ—

বার কয়েক চীৎকারের পর যে দুয়ার খুলিয়া দিল, সে যতীশ নয়, বছর তিনেকের ছোট একটী ছেলে।

দুয়ারের নিকট হইতে ছেলেটী আধ আধ স্বরে বলিল—বাড়ী নেই।

অপূর্ব্বর হঠাৎ যেন মনে হইল—এমনি শুভ্র, সুন্দর মুখ সে যেন

আর কোথাও দেখিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই ঠিক মনে করিতে পারিল না—কোথায়।—তবু তার প্রতি অপূর্ব্ব অকস্মাৎ এক অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করিল ; কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল—কে বাড়ী নেই ?

অপরিচিত লোকের কোলে উঠিয়া ছেলেটী ভয়ানক ভয় পাইয়া গিয়াছে। চোখ দুটী ছল-ছল করিয়া বলিল—বাবা !

অপূর্ব্ব বুঝিল, এ যতীশের ছেলে না হইয়া যায় না।

বলিল—তোমার বাবার নাম যতীশ ?

খোকা বলিল—জানি না।

অপূর্ব্ব বলিল—সে কি...তুমি ত ভারি বোকা।

সে কথার কোন উত্তর না দিয়াই, ছেলেটী হঠাৎ আনন্দে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল— ওই যে বাবা আসচে !

অপূর্ব্ব মুখ ফিরিয়া দেখিল, যতীশই বটে ! চোখে চশমা, গায়ে গরদের পাঞ্জাবী ও চাদর, হাতে একগাদা বই ও মোটা লাঠি লইয়া যতীশ এইদিকেই আসিতেছে !—হ্যাঁ, ঠিক প্রফেসারই বটে !

পাঁচ বৎসর পরে দুই বন্ধুতে অকস্মাৎ চোখোচোখি হইল ! খানিক কেহই কথা বলিতে পারিল না ; তারপর পরস্পরের নিঃশব্দ কর-পীড়ন শেষ হইলে, অপূর্ব্ব বলিল—কি হে চিনতে পারো—?

যতীশ বলিল—একেবারে Unexpected !

অপূর্ব্ব বলিল—উপায় নেই ! তোমার জীবনে এসেছে শান্তি ও শৃঙ্খলা, নিয়ম-ভঙ্গ হলে হয়ত উপরওয়ালার কোপ-দৃষ্টি সহ্য করতে হয়, কিন্তু—আমাদের পথের ঝড় এখনও থামেনি !

যতীশ বলিল—So I See, কিন্তু এ বেশ কেন ?

অপূর্ব্বর খালি পা, গায়ে উত্তরীয়, মাথার চুল রুক্ষ; মুখে দাড়ি গজাইয়াছে একমুখ!

অপূর্ব্ব বলিল—সব কথাই শুনবে, এত তাড়া কিসের? অন্দরে প্রবেশের অনুমতি হ'লে ধীরে সুস্থে সব কথাই বলতে পারি।

যতীশ বলিল—নিশ্চয়ই অনুমতি পাবে। কারণ, অন্দরে তোমার অপরিচিত লোক কেউ নেই! তোমার পাশ-পোর্ট সেখানে অবাধ!

যতীশের পিছনে পিছনে ভিতরে ঢুকিয়া অপূর্ব্ব বলিল—তার মানে?

বইগুলি একটি র‍্যাকের উপর নামাইয়া রাখিয়া যতীশ বলিল—মানে এখুনি প্রকাশ পাবে। দাঁড়াও খবর দিয়ে আসি।

অপূর্ব্ব যেন এক রহস্য-পুরীর মধ্যে পা দিয়াছে! এখানে সবই রহস্য, সবই বিস্ময়! অপূর্ব্বর পরিচিত কাহাকে যতীশ ....?

...না, সে অসম্ভব।

অপূর্ব্ব উদ্বেলিত মন লইয়া ঘরের চারিদিকে দেখিতে লাগিল। চারিদিকে একটা চমৎকার শৃঙ্খলা, সর্ব্বত্র সুরুচির পরিচয়! ঘরটাকে আসবাব পত্রে অযথা ভারাক্রান্ত করা হয় নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা চোখ ও মনকে তৃপ্তি না দিয়া পারে না।

যতীশ ফিরিয়া আসিল—মুখে হাসি ও প্রফুল্লতা মাখান! এ' যেন সেই মন-মরা নির্জীব যতীশই নয়;—একটা সঙ্কীর্ণ নদীতে হঠাৎ যেন খরস্রোত প্লাবন আসিয়াছে!

বলিল—একটু অপেক্ষা, এখুনি আসচে। কিন্তু তোমার কথা

গল। একখানি মাত্র চিঠি দিয়ে হঠাৎ এমনি ডুব দিলে যে, অপূর্ব্ব বলে সংসারে কেউ ছিল কি না ছিল—তাই ভুলে গেলাম।

অপূর্ব্ব বলিল—অনেকটা ইচ্ছে করেই দিই নি। এখানকার কথা একেবারেই মনে রাখব না ভেবেছিলাম। ফেরবার ইচ্ছেও ছিল না, কিন্তু হঠাৎ বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে...

যতীশ কহিল—সে কী!—আশুবাবু মারা গেছেন!

অপূর্ব্ব কহিল—সেই জন্যেই ত' এই বেশ!

যতীশ বলিল—কিন্তু এত হঠাৎ—?

—ঠিক হঠাৎ বলতে পারি না। যাবার সময় তাঁকে অনেক মনোকষ্ট দিয়ে গিয়েছিলাম, একমাত্র ছেলেকে বিলেত পাঠাবার তাঁর ইচ্ছেও ছিল না, তা ছাড়া শেষের কয়মাস চিঠি পত্র লেখাও দিয়েছিলাম বন্ধ করে।

যতীশ বলিল—কী আশ্চর্য্য! তুমি যে তাঁর ওপর এত কঠিন হ'তে পার, এ' আমি স্বপ্নেও ভাবি নি!—কেন তাঁর অপরাধ?

—অপরাধ!...না, সে সব কথায় আজ একেবারেই কাজ নেই! অপরাধ আমারই বুঝলে যতীশ, আমার কথা ভেবে ভেবেই হঠাৎ তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেছে। কিন্তু আমার সমস্ত কথা শুনলে, বোধ হয় তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে—

যতীশ কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিল—ইলা!

—ক্ষমা আমাকেও করবেন অপূর্ব্ব বাবু, দেরী হয়ে গেল।

অপূর্ব্ব ভদ্রতা রাখিয়া কথা বলিতে গেল, কিন্তু স্বর ফুটিল না,—

যেন সম্মুখে হঠাৎ প্রেত দেখিয়াছে! যে-অতীত তার মনের মধ্যে মরিয়া ভূত হইয়া গেছে—তাহারই প্রেতচ্ছবি!

যতীশ বলিল—খুব বড় রকমের Surprise কি না বল? কখনও Expect করেছিলে?

—না।

ইলাও একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। বলিল—এ রকম বেশ কেন অপূর্ব্ব বাবু?

অপূর্ব্ব কারণ জানাইল।

তারপর খানিক নিস্তব্ধতা!...অপূর্ব্বর মনে যেন ঝড় উঠিয়াছে! ইলা—যতীশের বউ, তার বন্ধুর-বৌ! এটা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে, অপূর্ব্ব তা কল্পনাই করিতে পারে না! যেন স্বপ্ন দেখিতেছে...

ইলাই স্তব্ধতা ভাঙ্গিল।

—কবে এলেন?

—মাত্র আজ সকালে।

—তবু ভাল যে, এসেই বন্ধুকে মনে পড়েচে। দার্জ্জিলিং ছেড়ে আসবার সময় চিঠি দেবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা ত' আজও পেলুম না!

অপূর্ব্ব হাসিল। সে হাসির অর্থ যে কত গভীর, কে তাহার পরিমাণ রাখে। কেন ইলাকে সে চিঠি লিখিতে পারে নাই, সে কথা ইলা জানিবে কোথা হইতে!

বলিল—চিঠি দেবার ইচ্ছে বরাবরই ছিল, হঠাৎ বিলেত চলে যাওয়ায়—

—তা এমন হঠাৎ বিলেতই বা গেলেন কেন ?

—সে অনেক কথা, আপনার শোন্‌বার দরকার নেই।

যতীশ বলিল—তা না থাক, কিন্তু এতদিন বিলেতে থেকে করলে কি ?

অপূর্ব্ব বলিল—কি করলাম না বল ? প্রত্যহ বায়স্কোপ দেখলাম—ম্যাটিনীতে অ্যাটেণ্ড করলাম, কেফে বসে চা ও চুরুটের শ্রাদ্ধ করলাম—সমস্ত পৃথিবীটাই প্রায় ঘুরে এলাম, আরও চাও ?

ইলা বলিল—কোথায় কোথায় ঘুরলেন—?

—সে কি সব মনে আছে ? ক্যানাডা, নিউইয়র্ক, ভিনিস্, রোম, ভিয়েনা, বার্লিন্, হাম্বার্গ—

—এত দেশ ! কী দেখলেন—?

—সে কি এই টেবিলের ধারে বসে বলা সম্ভব ? তা নিয়ে একটা প্রকাণ্ড বই লেখা হয়ে যেতে পারে। আসল কথা, সেখানকার মিউজিয়েম, নাইট ক্লাব, হোটেল আর কেফগুলোতেই আমার সময় কেটেছে বেশী। আর কিছু বিশেষ লক্ষ্য করবার স্থযোগ হয়ে ওঠেনি।

ইলা বলিল—নাইট ক্লাব গুলোর সম্বন্ধে অনেক খারাপ কথা শুনা যায়, সে সব সত্যি ?

—অক্ষরে অক্ষরে। সেই জন্যেই ত সেগুলি আমার খুব ভাল লাগত। সেখানে মনুষ্যত্বের কোন দাম নেই, আছে—ডলারের—টাকার। স্থরা-পাত্র আছে সব সময় পূর্ণ হয়ে, এবং তা পান করবার লোকেরও অভাব নেই !

—তা ওসব জায়গায় যেতেন কেন ?

অপূর্ব্ব বলিল—সময় কাটাতে। অখণ্ড অবসর, কাজে লাগান চাই ত !...আপনি বোধ হয় জানেন না, এখান থেকে যাবার আগে হঠাৎ আমি প্রেমে পড়েছিলুম, কিন্তু তাকে পাবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। সেই দুঃখের একটা নাটুকে প্রতিশোধ নেবার জন্যেই,... বুঝলেন কি না ?

অপূর্ব্ব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ইলার একটু চমক লাগে—

যতীশ বলিল—ওর কথা একটুও বিশ্বাস ক'র না ইলা, ওটা একেবারেই বোগাস ! গল্প বানিয়ে বলতে ওর জুড়ী নেই ! চুলোয় যাক্,—যা শিখতে গিয়েছিলে তার কতদূর ?

অপূর্ব্ব বলিল—কিসের কথা বলচ ?

—তোমার কৃষিবিদ্যা শিখ্‌বার।

—কৃষিবিদ্যা কৃষকরা শিখুক। আমার ওসব হল না। মাস ছয়েক ক্লাসে গিয়েছিলুম,—তারপর সোজা ভিয়েনায় !

—তা হ'লে পরীক্ষা দাও নি !

—সত্যি না।

যতীশ বলিল—আশ্চর্য্য ! এতদিন তবে করলে কি ?

—আগেই বলেছি।

যতীশ তাহা বিশ্বাস করিল না। ইলা মৌন রহিল।

—কিন্তু আমার কথা এখন থাক যতীশ, তোমার কথা যে এখনও কিছুই শোনা হয় নি !

যতীশ বলিল—আমার ইতিহাস প্রকাণ্ড !

—তা হ'ক, বল না শুনি।

যতীশ বলিল—কি করে ইলার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'ল, সেটা বোধ হয় তুমি ভাবতেই পারনি। তুমি ত দূরের কথা আমি নিজেও কোন দিন সাহস করে ভাবিনি। ইলা নিজেই যদি সে সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশী উদ্যোগী না হ'তেন, তা হ'লে বোধ হয়—

অপূর্ব্ব ইলার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া দেখিল, সুগৌর মুখখানিতে রাজ্যের লজ্জা আসিয়া অস্ত-রবির আভা মাখাইয়া দিয়া গেছে ! কিন্তু সে লজ্জার মধ্যে আনন্দের তীব্রতা এত বেশী, যে, সেটা বুঝিতে কাহারও এতটুকু পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই।

প্রতিবাদের সুরে ইলা বলিল—দেখ, ফের যদি এমনি করে আমায় অপ্রস্তুত কর—তা' হ'লে কিন্তু...

যতীশ বলিল—বিশ্বাস কর অপূর্ব্ব, আমি এতটুকু অতিরঞ্জিত করে বলছি না...নিজের সৌজন্যের কথা উনি কিছুতেই স্বীকার করবেন না।

ইলা উঠিয়া দাঁড়াইল; চোখে বিদ্যুৎ হানিয়া বলিল—আমিও বলে রাখচি অপূর্ব্ববাবু, ওঁর সমস্ত কথাই বানানো...

ইলা দ্রুত পায়ে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

গেল বটে, কিন্তু একটা সুমধুর প্রীতির হিল্লোল যেন ঘর-ময় ঢেউ তুলিয়া ফিরিতে লাগিল।

এই স্বল্প কপট-কলহের মধ্য দিয়া ইলা ও যতীশের দাম্পত্য জীবনের যে সুমধুর ছবিখানির সৃষ্টি হইল, অপূর্ব্বর মনে সেটা কেমন লাগিল তাহা কেহ জানিলও না।

যতীশ বলিল—যতক্ষণে উনি ঘুরে আসবেন, ততক্ষণে কথাটা তোমায় বলে ফেলি। তুমি বিলেত যাবার মাসখানেক পরেই কলকাতায় ইলাদের সঙ্গে দেখা—ওদেরি মোটরের ধাক্কা খেয়ে।

অপূর্ব্ব হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—ধাক্কা খেয়েই বিয়ে!

—ঠিক তা নয়। তারপর বাবার অসুখের সময় ইলাকে কিছুদিন আমাদের ওখানে ছুটোছুটি করতে হয়, আনন্দবাবু তাতে রেগে অস্থির! আমার মত একটা বিদ্যে-সর্ব্বস্ব হতভাগার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে কি করে হয়, বলো? কিন্তু ইলা যে কবে মনে মনে আমাকেই আত্ম-সমর্পণ করে বসেছে—তা কে জান্‌তো। ও আমায় চিঠি লিখে জানাল—আমারই প্রতিষ্ঠার জন্যে ও অপেক্ষা করে থাকবে। ছিলও তাই। কত আই-সি-এস, বি-সি-এস এসে দরজা থেকে গেল ফিরে—ইলা সে দিকে ফিরেও চাইলে না। এদিকে আমিও করে দিলুম তপস্যা সুরু। কিসে আনন্দর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি, তার জন্যে কত অদ্ভুত চেষ্টাই যে করলাম ভাই, তা ভাবলেও হাসি পায়।...কিন্তু ভগবান সত্যি একদিন তপস্যার বর দিলেন। থিসিস্‌খানা হঠাৎ আশ্চর্য্য রকম উৎরে গেল, পেলাম—সরকারী কলেজের প্রফেসারী। চাকা গেল ঘুরে! মেয়ের ধনুর্ভঙ্গ পণের কাছে আনন্দকে হার মান্‌তে হ'ল।—ভারি আশ্চর্য্য, নয় অপূর্ব্ব?

অপূর্ব্ব বলিল—ভা-রি আশ্চর্য্য!

যতীশ বলিল—আমি তাই ভাবি। কি ছিল আমার? না চাল, না চুলো—তবু কি করে যে,...মেয়েদের মনটাই এক অদ্ভুত জিনিস, কি বলো অপূর্ব্ব?

অপূর্ব্ব মনে মনে একথা স্বীকার করিল।

মুখে বলিল—যাক, যে অদ্ভুত জিনিস পেয়েছো, তাকে যেন চিরকাল অদ্ভুত করেই রাখতে পার।...উঠি ভাই, ক'টা জায়গায় আবার নেমন্তন্ন করে যেতে হ'বে। আর হ্যাঁ, তোমার আর ইলারও সে দিন অতি অবশ্য যাওয়া চাই।

যতীশ বলিল—যাব নিশ্চয়ই, কিন্তু এত তাড়া কিসের? কত কাল পরে দেখা, একটু বসে যাও। ইলা চা আন্‌তে গেছে—

অপূর্ব্ব বলিল—অশৌচ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ওটা আর চলবে না। থাক, আর একদিন হ'বে।

যতীশ বলিল—How peculiar! ইলার সঙ্গে দেখা করে যাও, সে দুঃখ করতে পারে।

অপূর্ব্ব বসিল।

খানিক এ-দিক ও-দিক চাহিয়া বলিল—ওই দেখ, কি আশ্চর্য্য মন! রাধাবল্লভ বাবু কোথায়, দেখলাম না ত? আর লক্ষ্মী?

যতীশ বলিল—বাবাকে দিন কয়েক হ'ল দার্জ্জিলিঙে হাওয়া বদ্‌লাতে পাঠিয়েছি; আনন্দবাবুও সেইখানেই আছেন। আর, লক্ষ্মী শ্বশুর বাড়ী।

অপূর্ব্ব বলিল—বাঃ, Every thing going smoothly! লক্ষ্মীর বিয়ে কোথায় হ'ল,—কবে?

গত বৎসর লক্ষ্মীর বিবাহ হইয়াছে,—এই কলিকাতাতেই। যতীশ সে কথা বলিল।

চা ও মিষ্টান্ন লইয়া ইলা ঘরে ঢুকিল, কিন্তু অপূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত কারণে

সেগুলি গ্রহণ করিল না। বলিল—আর একদিন আপনার অতিথি-সৎকারের অভিলাষ স্বদে-আসলে পূরণ করিয়ে দিয়ে যাব, আজ মাফ করুন।

যাইবার সময় দেশের বাড়ীর ঠিকানা দিয়া যতীশকে বলিল—দেশেই বাবার কাজ হ'বে, কালই আমি সেখানে যাচ্চি। সকলে মিলে না গেলে ভারি দুঃখিত হ'ব।

খোকা ছাড়া পাইয়া কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিল; সেই সময় ঘরে ঢুকিয়া অপূর্ব্বর দিকে খানিকক্ষণ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাকাইয়া প্রশ্ন করিল—বাবা, এতা কে—?

ইলা লজ্জায় আর একবার রাঙা হইয়া উঠিল; যতীশ বলিল—দূর বোকা, 'এতা' বলতে নেই। ও যে তোমার কাকা।

খোকা অপূর্ব্বর কাছে আসিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল—তুমি কাকা?

অপূর্ব্ব তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া, চুমায় চুমায় তাহার মুখখানি ভরিয়া দিয়া বলিল—হুঁ, আমি তোমার কাকা।...তোমার নামটা কি শুনি?

খোকা বলিল—আমার নাম মন্তু—

ইলা বলিল—ও বদমাইসটার সঙ্গে বেশী ভাব করবেন না অপূর্ব্ব বাবু, এখুনি আপনার সঙ্গে যাবার জন্যে হাত-পা ছুঁড়ে কান্না স্বরু করে দেবে।

অল্পকাল পরে, সত্যই মণ্টু অপূর্ব্বর প্রতি অত্যন্ত বেশী মনোযোগ প্রকাশ আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাদের বাড়ী কত বড়, তাহার মুখে দাড়ি কেন, সে কেন জুতা পরে নাই, রোজ সে তাহাদের এখানে



(অপূর্ব্ব, যতীশ ও ইলা)

অপূর্ব্ব ইলার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া দেখিল, সুগৌর মুখখানিতে রাজ্যের লজ্জা আসিয়া অস্ত-রবির আভা মাখাইয়া দিয়া গেছে ! পৃষ্ঠা ৯৩

আসিবে কি না...ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্নে সে অপূর্ব্বকে জড়াইয়া ফেলিল।

উত্তর দিতে দিতে অনেকখানি গেল। কিন্তু ইহাদের এত আনন্দের মধ্যেও অপূর্ব্ব যেন মনস্থির করিতে পারিল না; সে যেন এই শান্ত গৃহ-নীড়ের মাঝে অত্যন্ত খাপ-ছাড়া ও একেলা।

হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব বলিল—আর নয়, ভয়ানক দেরী হয় গেল—জিনিস পত্র এখনও কিছুই কেনা হয় নি।

১৩

অপূর্ব্ব ঘটা করিয়া আশুবাবুর শ্রাদ্ধ করিল, আশ-পাশের গ্রামের ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত দল বাঁধিয়া লুচী-মণ্ডা খাইয়া গেল।

যতীশরা আসিতে পারে নাই—ইলার হঠাৎ অসুখ হইয়া পড়িয়াছিল। অসুস্থ ইলাকে রাখিয়া যতীশ কেমন করিয়া আসে? যদিও অসুখ নিতান্ত সামান্য—বোধ হয় মাথা ধরিয়াছিল, কিম্বা এমনি কিছু।

এই সামান্য ঘটনার ভিতর দিয়া ইলা ও যতীশের আকর্ষণের নিবিড়-তার পরিচয় আর একবার অপূর্ব্বর চোখে পড়িল।

এ'কয় দিন কাজের ভিড়ে অপূর্ব্বর নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর ছিল না। কতকাল পরে দেশে আসিয়াছে—প্রতিবেশীদের চাটু-কথায় তাহাকে অস্থির হইয়া যাইতে হইয়াছিল। সে চাটু-বাক্যে অপূর্ব্ব এতটুকু কাণ দিতে পারে নাই, অত্যন্ত গুরুভার একটা জিনিস তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল।...

কাজ কর্ম্ম চুকিয়া গেলে অপূর্ব্ব নিজের দিকে মনোনিবেশ করিল।

সে দিন যে অকল্পিত দৃশ্যটা সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাতে কেবল এই কথাটাই অপূর্ব্বর মনের মধ্যে বড় হইয়া দেখা দিল, যে, এই ইলাকে কেন্দ্র করিয়া মনে মনে সে কত কাব্য রচনা করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল, তাহাকে পাইলে ইলা নিজেকে ধন্য মনে করিবে।

এই ভুল ধারণাটা কেমন করিয়া, কোথা দিয়া তার মনের মধ্যে

শিকড় গাড়িয়াছিল, তাহা ভাবিতে গিয়া অপূর্ব্বর ভারি হাসি পাইল! জগতে অত্যন্ত চালাক মানুষগুলি সময়ে সময়ে কী মারাত্মক ভুলই না করিয়া ফেলে!

বাহিরে জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিতেছে। দ্বিতলের জানালা দিয়া অপূর্ব্ব দেখিল—গাছপালা, আকাশ, মাটী—সব যেন জ্যোৎস্নায় ভিজিয়া গেছে। দার্জ্জিলিঙের জ্যোৎস্না ও আজিকার মধ্যে কত বড় প্রভেদ!

কিন্তু তার জন্য অপূর্ব্ব মাথা খুঁড়িয়া মরিবে না। যাহা গিয়াছে, সেটা আর ফিরিবার নয়। ইলা তার বন্ধু-পত্নী—যতীশের সহ-ধর্ম্মিণী, যে যতীশের সঙ্গে সেই সুদূর শৈশবে তার প্রথম পরিচয়; যে যতীশ কিছুতেই দার্জ্জিলিঙ যাইতে চাহে নাই—সেই জোর করিয়া লইয়া গিয়াছিল। ভালই হইল, তার বন্ধু ইলাকে বিবাহ করিয়াছে, আর কেহ নয়। ইলা নিশ্চয়ই আজীবন কুমারী থাকিত না; হয়ত কোন বড় লোক ব্রুটের হাতে পড়িয়া আজীবন জ্বলিয়া মরিত। যতীশের কাছে সে ভয় নাই, যতীশ একটা মানুষের মত মানুষ; তার প্রবল প্রেম ইলাকে নিত্য-কাল অক্ষয় কবচের মধ্যে ঘিরিয়া রাখিবে।

সেই স্নেহ-প্রীতিস্নিগ্ধ সুখ-নীড়ের মধ্যে অপূর্ব্বর স্থান কোথায়?

অপূর্ব্ব কলিকাতায় ফিরিল না।

কোন কাজ নাই,—অনন্ত, উদার অবকাশ। মাও কলিকাতার কোলাহল হইতে দূরে—গ্রামের নির্জ্জনতার মধ্যে নিজের দুরন্ত শোককে নিরালায় সান্ত্বনা দিতেছেন।

অপূর্ব্ব গ্রামে গ্রামে নিজের প্রজাদের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়। অর্থ-নীতির পুস্তকে সে ইহাদের দুঃখ-দুর্গতির অনেক কথাই শিখিয়াছে,

ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে দেখিল, তাহাদের দুঃখ তার চেয়েও অনেক গুণ ভয়ঙ্কর।...

অনেকে বীজ রাখিবার সঠিক উপায় জানে না. পোকা ধরিয়া গেলে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া মহাজনের কাছে চড়াদরে বীজ কিনিতে ছোটে। অনেক মাঠে আবাদ হইয়াছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ জলের অভাবে সব বুঝি জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। কবে আকাশে মেঘ ঘনাইবে, পরমেশ্বর দয়া করিয়া দু' ফোঁটা জল দিবেন—সেই আশায় তাহারা নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছে।

এক একটা গ্রামে প্রায় এক হাজার করিয়া চাষীর বাস। মাথা পিছু দুই তিন টাকা খরচ করিলে সমস্ত মাঠগুলিতে কলের দ্বারা জল সরবরাহ করা যায়। কিন্তু সেই নিরক্ষর কৃষককুলকে এ কথা বুঝানই কঠিন যে, আকাশে জল না নামিলেও অন্য উপায়ে মাটীতে ফসল ফলানো সম্ভব।

অপূর্ব্বর কথা শুনিয়া তাহারা বলিল—কি যে বলো বাবু, তার হদিস পাই না। খোদাতাল্লা ফসল হ'তে দ্যালেন না, তুমি কল বসাইয়ে এতগুলো মাঠে দেবে জল!

অপূর্ব্ব ইহাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রশংসা করিল, কিন্তু বুদ্ধির প্রশংসা করিল না। ইহাদের এমনি ভাবে মৃত্যুর পথে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। কোটী কোটী রোগজীর্ণ, বুদ্ধি-হীন কৃষক লইয়াই এই দেশ—এত বড় দেশের উদরান্ন জোগাইবার ভার ইহাদেরই হাতে। ইহাদের সে ছাড়িবে না; তার স্থান ইহাদেরই মাঝখানে, জনতা-পঙ্কিল সহরের মাঝখানে নয়।

অপূর্ব্ব একদিন নিজেকে এ'সব হইতে যথা সম্ভব দূরে রাখিত; পৃথিবীটাকে দেখিত কবির চোখ লইয়া, নিজের উপর তার ছিল অখণ্ড বিশ্বাস; ভাবিত—ইচ্ছা করিলে পৃথিবীটাকে সে মুঠার মধ্যে টানিয়া রাখিতে পারে।

কিন্তু সে মুষ্টি আজ শিথিল, সে অহঙ্কার তার নাই। যেখানে সে মনে মনে সকলের বড় গর্ব্ব পোষণ করিত—সেইখানেই লাগিয়াছে নির্দ্দয় একটা আঘাত। আর সে দিকে নয়।

এই অসংখ্য উৎসাহহীন ম্লান মানুষের মুখে এতটুকু হাসি ফুটাইয়া তুলিতে পারিলে সে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে।

সঙ্কল্পিত কাজের আয়োজন করিতে করিতে এক মাস কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে কলিকাতায় ফিরিবার ইচ্ছা অনেকবার হইলেও, একবারও সে গেল না।

সে দিন দু'পহরে আহারের পর, অপূর্ব্ব দ্বিতলের ঘরে বিশ্রাম করিতেছিল; চাকরটা একখানি চিঠি দিয়া গেল। চিঠি ইলার।

তাহাদের অনুপস্থিতির জন্য আর একবার দুঃখ প্রকাশ করিয়া ইলা জানিতে চাহিয়াছে—এই এক মাসের মধ্যে তাহার কলিকাতায় ফিরিবার সময় হইল না কেন? উনি অর্থাৎ যতীশ, তাহাদের বাড়ীতে গিয়া একাধিকবার খোঁজ লইয়াছেন, কিন্তু সেখানে কাহারও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাহার অসুখের জন্য যতীশ আশুবাবুর শ্রাদ্ধ-বাসরে উপস্থিত হইতে পারে নাই বলিয়া সে (অপূর্ব্ব) যদি রাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইলা ভারি দুঃখ পাইবে। যদি তা না হয়, তবে অপূর্ব্ব কি কারণে তাহাদের ত্যাগ করিল, সে কথাও ইলা জানিতে

চাহিয়াছে। মণ্টু—অর্থাৎ ইলার ছেলে কাকাবাবুকে দেখিবার জন্য নাকি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। সে দিন ত' সে এমন কান্না জুড়িয়াছিল যে...ইত্যাদি।

অপূর্ব্ব চিঠিখানি বারম্বার পাঠ করিল। মনে পড়িল, পরিচয়ের প্রথম পর্ব্বে ইলা তাহাকে দার্জিলিঙে যে ছোট্ট চিঠিখানি লিখিয়াছিল। সেই সুন্দর হস্তাক্ষর বটে—কিন্তু কত প্রভেদ—কত যুগের ব্যবধান যেন!

অপূর্ব্ব মনে মনে হাসিল।

যতীশ বলিয়াছিল—নারীর চরিত্র ভারি কঠিন; সে কথা সত্য। নহিলে দার্জিলিঙের ইলা ও যতীশের পরিণীতার মধ্যে এত বড় পার্থক্য আসিল কোথা হইবে?

পরদিন সকালে গ্রামের চাষাদের কয়েকটা ছেলে-মেয়ে, হাতে এক একটা রাখী লইয়া অপূর্ব্বদের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

অপূর্ব্ব বলিল—ও আবার কি?

তাহারা বলিল—তাহাদের পিতামাতা, কৃতজ্ঞতার সামান্য পরিচয় স্বরূপ এই গুলি তাহার হাতে বাঁধিয়া দিতে পাঠাইয়াছে।

অপূর্ব্বর মা বলিলেন—জিনিস সামান্য, কিন্তু তুই আজ ওদের বাপ-মায়ের যে উপকার করতে বসেচিস—ওইটুকুর মধ্যে দিয়ে তারা তোর জন্যে পাঠিয়েছে—তাদের প্রাণের অজস্র কৃতজ্ঞতা। আজ যে রাখী-পূর্ণিমে। ভাই, বন্ধু, আত্মীয়—সবাইকে আজ এই স্নেহের বাঁধন দিয়ে বাঁধতে হয়।

অপূর্ব্ব প্রফুল্ল মনে কৃষক-পিতা ও কৃষক-জননীদের এই সামান্য

অথচ মহামূল্য দান গ্রহণ করিল। রাখীতে রাখীতে তার হাত গেল বোঝাই হইয়া।

এক পয়সা দামের রাখীর পরিবর্ত্তে এক একটা টাকা পাইয়া ছেলের দল মহা আনন্দে গ্রামের পথ ধরিয়া কলরব করিতে করিতে ফিরিয়া গেল।

আনন্দে, গর্ব্বে অপূর্ব্বর চোখে জল দেখা দিল।—এই দরিদ্র, মূর্খ কৃষকদল যে তাহাকে বন্ধু বলিয়া মানিয়াছে, এ' তাহার মস্ত সম্মান! সবাই তাহাকে আজ নিকটে টানিয়াছে, কেবল...

নাঃ—অপূর্ব্ব সে সম্বন্ধে এতটুকু কালী মনের মধ্যে রাখিবে না।

রাত্রে অপূর্ব্ব নিজের ঘরের সব ক'টা বাতায়ন খুলিয়া দিয়া, ইলাকে চিঠি লিখিতে বসিল। কিন্তু একদিন কলিকাতায় যে চিঠি লিখিতে বসিয়া সে শেষ করিতে পারে নাই—তার সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্য নাই! জ্যোৎস্না-ধূসর আকাশের দিকে চাহিয়া মনে পড়িল, কোন দিন বিস্মৃত শৈশবে একদিন সে যতীশকে গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিল, তাহাদের বন্ধুত্ব অমর—ক্ষয়হীন; কেউ তা ভাঙ্গিতে পারিবে না।

কিন্তু আজ!

—সে দিন কোথায় ছিল ইলা, কোথায় ছিল যতীশের ইলার প্রতি প্রবল প্রেম! এই সামান্য বাধাতেই তার সেই গর্ব্ব একেবারে ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া যাইবে! কে ইলা, কোথায় ছিল সে? তাহার ও যতীশের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিবার অধিকার সে কোথায় পাইল?

না; সে হয় না।

অপূর্ব্ব লিখিল—

ভোরের আলো

দার্জিলিঙ হইতে ফিরিয়া আপনাকে চিঠি লিখিবার কথা ছিল, এতদিন পরে আজ তার অবকাশ হইল ভাবিয়া ভারি হাসি পাইতেছে! কিন্তু সে কথা থাক্।

আপনি জানিতে চাহিয়াছেন, যতীশ বা আপনি আসিতে না পারায় আমি রাগ করিয়াছি কি না,—সত্যই আমি রাগ করিয়াছিলাম; কারণ, আপনার সহিত তাহার পরিচয়ের যখন কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তখন হইতেই আমরা পরস্পরকে জানিয়াছি। এমন রাগ আমাদের কতবার হইয়াছে, আবার আলোর স্পর্শে কুয়াসার মত মিলাইয়া গিয়াছে। ছেলেবেলায় আমরা রাগও যেমন করিতাম—কথায় কথায়, ভাবও হইত—তেমনি সাধিয়া সাধিয়া। সুতরাং, এবারও আপনি চিঠি না লিখিলেও, নিশ্চয়ই যতীশের সঙ্গে আমার মুখ দেখা-দেখি বন্ধ হইত না। সেই কারণেই আপনার ব্যাকুলতা ও দুর্ভাবনা অনেকখানি নিষ্প্রয়োজন।

কেন যাইতে পারি নাই, সে কথাটা বলা আবশ্যক। ঠিক ছিল, কাজ-কর্ম্ম চুকিয়া গেলেই কলিকাতায় ফিরিব। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিলাম, গ্রামে বাড়ী আছে অসংখ্য—লোক তার তুলনায় ঢের কম, রৌদ্রালোকিত আকাশের নীচে, মাঠের-পর মাঠ সেই চক্রবালের কোলে গিয়া ঠেকিয়াছে, কিন্তু সব গুলিতে চাষ হয় না। যারা মাটীর বুকে সোণা ফলাইবে, ব্যাধিতে, অভাবে তাহাদের কর্ম্মঠ শরীর ভাঙ্গিয়া, বাঁকিয়া গিয়াছে। আমি কোন দিন ইহাদের জন্য মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করি নাই, কিন্তু এখানে আসিয়া অত্যন্ত হঠাৎ ইহাদের প্রতি এক অপূর্ব্ব আত্মীয়তা অনুভব করিলাম।

অল্প ব্যয়ে কি করিয়া তাহারা প্রচুর শস্য ফলাইতে পারে, কি করিলে তা'দের ব্যাধি-স্ফীত উদরের পরিধি কমে—এই সব উৎকট ভাবনা চাপিয়া বসিল আমার মাথায়।

কাজে লাগিয়া গেলাম, এবং এরই জন্য কলিকাতায় ফেরা হইল না।

যে কাজে হাত দিয়াছি, তাহাতে আনন্দের অবকাশ যেমনি প্রচুর, ভয়ের কারণও তেমনি অজস্র। কারণ, যে লোভ ইহাদের দেখাইয়াছি, তাহা সফল করিতে না পারিলে ইহারা মনে মনে আমার মুণ্ড-পাত করিবে।

জীবনে আমি অত্যন্ত বিলাসী, কর্ম্ম-বিমুখ, নিরুদ্বিগ্ন ছিলাম। কিন্তু একজন আমাকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছে। সে কে তা আপনার পক্ষে জানা নিষ্প্রয়োজন। সে যে আঘাত আমাকে দিয়াছে, তাহাতে সমস্ত জীবনটাই হয়ত পক্ষাঘাতে পঙ্গু হইয়া যাইত, কামনা করিবার কিছু থাকিত না। ঈশ্বরকে বহু ধন্যবাদ—পথ খুঁজিয়া লইতে আমার বিলম্ব হয় নাই। এখন দেহে অজস্র শক্তি আর মনে অফুরন্ত উৎসাহ,—এইটুকুই আমার প্রার্থনার। আমার মনের এই দ্বিতীয় স্বপ্নটাকে যদি সফল করিতে পারি, তবে প্রথম স্বপ্নের ব্যর্থতার জন্য আমি কিছুমাত্র শোক করিব না।

আমার ত মনে হয়, আমার গোড়াকার স্বপ্নটা যদি হঠাৎ রূঢ় আঘাত পাইয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া না যাইত, তবে নিজেকে আমার চেনা হইত না, আমার আপনাকে আমি আবিষ্কার করিতে পারিতাম না। এই জন্যই তাহাকে আমি এতটুকু অভিশাপ দিই নাই, বরং তার

সেই আঘাতটাকে আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনে করিয়াছি। ধরণীর মর্ম্মভেদ করিয়া যে ভোগবতী-ধারা উঠিয়াছিল, তাই ত' মুমূর্ষু পাণ্ডব-পিতামহকে দিয়াছিল—নূতন প্রাণ, অপূর্ব্ব সান্ত্বনা!

যাক্, কি সব বাজে কথা লিখিতেছি! আপনাকে এ সব লেখার কোন প্রয়োজনই ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না—তবু লিখিয়া ফেলিলাম।

যতীশ নিশ্চয়ই অফুরন্ত উৎসাহ লইয়া কাজ করিতেছে। করিবেই বা না কেন? আপনার অজস্র প্রেম তাহাকে নূতন জীবন-মন্ত্র দিয়াছে, এ' ত নিজের চোখেই দেখিয়া আসিয়াছি। আশা করি, প্রত্যেক প্রভাতে আপনাদের দাম্পত্য-জীবনের এক একটী নূতন ও মধুময় অধ্যায় উদ্ঘাটিত হ'ক, আপনার স্নেহ ও সেবা যতীশকে অক্ষয় ঐশ্বর্য্য ও পরমায়ুতে ভরিয়া তুলুক, জীবনে যেন এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্বাদ অনুভব করিবার প্রয়োজন না হয়। এর চেয়ে বড় শুভ-কামনা আমার জানা নাই। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, যেখানে মনের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, সেখানে বাহিরের ঝড়-ঝাপ্‌টা এতটুকু ক্ষতি করিতে পারে না।

কবে যাইতে পারিব—জানিতে চাহিয়াছেন। গোল বাধিয়াছে ওইখানেই। যে বিরাট কল্পনা মনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে, সেটার গোড়া-পত্তন না করিয়া এখান হইতে এক পা-ও নড়িবার উপায় নাই।

কাজ কিছু কিছু আরম্ভ করিয়া দিয়া আর একবার বিলাতে যাইবার বাসনা আছে। আপনি বোধ হয় এ কথা শুনিয়া রাগ করিবেন, কিম্বা হাসিয়া অস্থির হইবেন; কিন্তু এবার সেখানে গিয়া সত্য সত্যই কিছু শিখিতে হইবে। বিশ্বাস করুন, এবার আর প্যারিস-